রুল অফ থ্রি

ভাস্কর

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়—১৩৬২

দুই টাকা আট আনা

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

সবস প্রবন্ধ ও গল্প :

লেখা — ৩৲

সবস গল্পেব বই :

শুভশ্রী — ১৷৷৹

মজলিস — ১৷৷৹

কথিকা — ১৷৷৹

ভজহরি — ১৷৷৹

ভাস্করের শ্রেষ্ঠ
ব্যঙ্গ গল্প — ৫৲

উপন্যাস :

পূর্ণিমা — ৩৷৷৹

জীবনী :

বাংলার একটি
বিস্মৃত রত্ন — ১৲

প্রবন্ধ :

গাণতের ভিত্তি — ৷৷৹

শিক্ষার কথা — ২৲

কবিতা :

ভাগীরথী — ১৷৷৹

রুল অফ্‌ থ্রি

রুল অফ্ থ্রি

এক

শ্যামল মেসে থাকে। অতি সামান্য একটি চাকরি করে। কোন মতে মেসের খরচটা চলে। এই পর্য্যন্ত।

প্রতি রবিবারের ইংবাজি ও বাংলা কাগজ দেখিয়া দেখিয়া দরখাস্ত করে। কিন্তু উত্তব আসে না। উত্তর না আসিতে আসিতে উত্তর আসা যে সম্ভব, তাহাও যেন শ্যামলের আর বিশ্বাস হয় না। তবু দরখাস্ত সে করিতেই থাকে।

একদিন কিন্তু সত্যই উত্তব আসিল। শ্যামল ইণ্টারভিউ দিয়া আসিল। কয়েকদিন পরে আসিল নিয়োগ-পত্র। বেতন তিন শত টাকা। এরূপ একটা ব্যাপাব শ্যামলের স্বপ্নাতীত। শ্যামলের মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। হযতো মাথাটাও একটু ঘুরিয়া গেল।

চাকুরি আরম্ভ করিয়াছে। কিছু কাপড় জামাও কিনিতে হইয়াছে। রোজ সকালে ঠাকুরকে সময়মত ভাত দিবার জন্য তাগিদ দিতেছে। মাঝে মাঝে আনমনা হইয়া শিশ দেওয়া বা দু-একটা গানের কলিও গাওয়া হইতেছে।

দিনের পর রাত্রি আসে, রাত্রির পর দিন আসে, ঠিক তেমনি বাঙালীর জীবনে চাকরির পর আসে বিবাহ। শ্যামলও এ নিয়মের

ব্যতিক্রম নয়। শ্যামলও বিবাহের কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার পরিচিত ও অপরিচিতেরাও তাহাকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

হঠাৎ একদিন শ্যামল চিন্তা করিয়া ফেলিল,, আচ্ছা এইতো মেসের নবীনবাবু, যোগেনবাবু, মোহিতবাবু। এঁরা তো কেউই এক শ' টাকার বেশি মাইনে পান না। এঁরা তো সকলেই বিয়ে করেছেন। তা এক শ' টাকা মাইনে পেয়ে যদি একটা বিয়ে করা যায়, তা হ'লে তিন শ' টাকা মাইনে হ'লে তিনটে বিয়ে কেন করা যাবে না? বরঞ্চ 'কমন এস্টাব্লিশমেণ্ট' বলে আরো সুবিধে।

শ্যামল তৎক্ষণাৎ একটা আঁক করিয়া ফেলিল—

১০০৲ : ৩০০৲ : : একটি স্ত্রী : x

উত্তর, ৩। সুতরাং আর কোন দ্বিধার কারণ রহিল না।

যেমন চিন্তা, তেমনি কাজ। ঘটক অফিসে গিয়া সবিশেষ আলোচনা করিয়া সব ব্যবস্থা করা হইল। এইরূপ সৎকার্যে পাছে কেহ বাধা দেয়, বা কন্যাপক্ষীয়েরা আপত্তি কবেন, সেইজন্য সব ব্যবস্থাই যথাসম্ভব গোপনে এবং সতর্কতার সহিত নিষ্পন্ন করা হইল। তিনটি বিবাহ স্থির হইল তিন স্থানে। একটি রংপুর জেলায়, একটি কুমিল্লায় এবং অপর একটি বাঁকুড়ায়।

তিনটি বিবাহই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। তিনটি শ্বশুরালয়ের সকলেই চাকুরিয়া পাত্রের হস্তে কন্যা সমর্পিত হইল দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। শ্যামল তিন স্থানেই বলিয়া আসিল, কলিকাতায় ফিরিয়াই সে মেস ছাড়িয়া বাসা স্থির করিয়া স্ত্রীকে লইয়া গিয়া নূতন সংসার পাতিবে। তিনটি শ্বশুরবাড়ী ও তিন প্রস্থ শ্যালী-শ্যালক সংগ্রহ করিয়া শ্যামল হৃষ্টচিত্তে কলিকাতায় ফিরিল।

কলিকাতায় বাড়ী পাওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু অধ্যবসায়ের ফলে

শ্যামবাজারের একটি গলিতে একখানি দোতলা ফ্ল্যাট গোছের বাড়ী মিলিয়া গেল। শ্যামল তল্পীতল্পা লইয়া নূতন বাসায় আসিয়া উঠিল। আপাতত একটা ঠিকা ঝি হইলেই চলিবে। কয়দিন মধ্যেই স্ত্রীরা আসিয়া পড়িলে আর লোকজনের প্রয়োজন থাকিবে না। কমন এসটাব্লিশমেণ্টের এইতো সুবিধে।

নূতন বাসায় আসিয়া শ্যামল তিন ঠিকানাতেই পত্র লিখিয়া জানাইল, বাসা ঠিক হইয়াছে। একটা ভাল দিন দেখিয়া যেন কেহ তার স্ত্রীকে কলিকাতার বাসায় রাখিয়া যায়।

সে সময়ের কাছাকাছি একটি খুব ভাল দিন ছিল পঞ্জিকায়। তিন শ্বশুরালয়েই সেই একই পঞ্জিকা। সকলেই একদিনই শুভদিন স্থির করিয়া যাত্রা করিলেন। রংপুরীকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন তাহার দাদা, বাঁকুড়ানীকে তাহার কাকা এবং কুমিল্লানীকে তাহার মামা। একদিন সকালে দশটা হইতে এগারটার মধ্যে তিনজনেই শ্যামলের বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

দাদা, কাকা ও মামা ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। উঃ, কি ভয়ানক লোক!

শ্যামল তাঁহাদিগকে কাছে বসাইয়া কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাঁহাদের গাম্ভীর্য লক্ষ্য করিয়া আপ্যায়ন স্থগিত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি ভাবছেন?

দাদা বলিলেন, ভাবছি অরুণার কথা। কি ভয়ানক লোক আপনি!

মামা বলিলেন, কি সাহসে তুমি এমন কাজ করলে! লোকে একটা বিয়ে করতে দশবার ভাবে, আর তুমি—। ভেবে দেখো তো করুণার কথাটা একবার! কতবড় অন্যায় তুমি করেছ!

কাকা বলিলেন, উঃ, বরুণার ভাগ্যে এই ছিল!

শ্যামল বলিল, আপনারা এত উতলা হচ্ছেন কেন বলুন তো? লোকে একশ' টাকা মাইনে পেয়ে কি একটা বিয়ে করে না? তাহ'লে তিনশ' টাকা মাইনে পেয়ে তিনটে বিয়েতে এমন কি দোষ হ'ল? তা ছাড়া কমন এস্টাব্লিশমেণ্টে বরং কত সুবিধে।

কাকা বলিলেন, শুন্‌লে একবার জামাইয়ের কথা। উঃ।

শ্যামল উঠিয়া গেল। দাদা, মামা ও কাকা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কিছুক্ষণ ভাবিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, কোন উপায় নাই। একবার ভাবিলেন, এ বাড়ীতে জলগ্রহণ না করিয়া এখনই এ পাপপুরী ত্যাগ করিয়া যাইবেন। কিন্তু ইহাদের সকলেরই বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। তাই ইহারা স্থির করিলেন, আহারাদি শেষ করিয়াই রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া এ স্থান ত্যাগ করিবেন।

এদিকে অরুণা, করুণা ও বরুণা পরস্পরকে দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত, পরে দুঃখিত, তারপরে স্তব্ধ হইয়া গুম্ হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। কিন্তু তাহাদেরও রীতিমত ক্ষুধা পাইয়াছে। দাদা, মামা ও কাকা পথ-ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়াছেন। অরুণা বলিল, দেখি, বাড়ীতে খাবার কোন ব্যবস্থা আছে কি না।

শ্যামল এই কথা শুনিয়াই বলিল, ব্যবস্থা করেছি বৈকি! রান্না প্রায় হয়ে এল। এবেলাটা কোন রকমে চালিয়ে নাও। ওবেলা থেকে তো তোমরাই সব দেখে শুনে নিতে পারবে।

শ্যামলের সহিত কোন কথা না বলিয়া তিন বউ মিলিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। সেখানে একটি ঠিকা ঠাকুর ঠিকা ঝির সহিত তাহাদের বাবুর সৌভাগ্যের কথা আলোচনা করিতেছিল। ইহারা

তাড়াতাড়ি আহারের ব্যবস্থা শেষ করিয়া দাদা, মামা ও কাকাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়া দিল।

অরুণা বলিল, দাদা, সব তো দেখে গেলে। একটু খোঁজ-খবর নিও। বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিল।

দাদা বলিলেন, ভেবেছিলাম, এখানে ক'টা দিন থেকে যাবো। কতদিন পরে কলকাতায় এলাম। কিন্তু আমার ধৈর্য নেই। জানিনে, মা বাবা শুনলে কি কাণ্ড করবেন।

ভেবে আর কি করবে? সবই ভাগ্য!

করুণা বলিল, মামা, সব তো দেখে শুনে গেলে। কি আর বল্‌ব। ভাগ্যিস্ মা-বাবা বেঁচে নেই। ভেবেছিলাম, তোমাকে কয়দিন এখানে রাখব। কিন্তু কাজ নেই তোমার এখানে থেকে। তুমি এখান থেকে এখুনি চলে যাও।

বরুণা বলিল, কাকা, সব তো দেখে শুনে গেলে। বলবার আর কি আছে! সবই ভবিতব্য! তোমার আর এখানে একদণ্ডও থেকে কাজ নেই।

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে বরুণা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাকা বলিলেন, মা, অত উতলা হয়ো না। ভগবানের ব্যবস্থা মাথা পেতে নিতে হয়।

তারপর অরুণা, করুণা ও বরুণা তিনজনকেই কাছে ডাকিয়া তাহাদের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কাকা সস্নেহে বলিলেন, তোমরা আর মন খারাপ করো না। সতীন নিয়ে ঘর তো আমাদের দেশে অনেকেই করেছে। রাজা দশরথেরও তো তিন রাণী ছিল।

অরুণা ফোঁস করিয়া উঠিল, আহা, কি সুখের সংসারই ছিল!

নেহাত রাম লোকটা ভাল ছিল, তাই ও বংশের অত নামডাক। নইলে অমন রাজার আর অমন রাজত্বের মুখে—

ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই। ও কথা যাক্। এখন শোন। আমি তোমাদের সকলেরই কাকা! আমার কথা শোন। তোমরা মনের খেদ সব মুছে ফেল। বেশ মন খুলে আনন্দে ঘর-সংসার করো। পরস্পরের সুখ-দুঃখের সাথী হও। আমাদের জামাইবাবাজী একটু খেয়ালী হলেও লোকটা খুব খারাপ নয়। তোমরা মিলেমিশে বুঝে-সুঝে চল, ওকেও চালিয়ে নিও। আশীর্বাদ করি, যেন তোমাদের সংসার সুখের হয়।

করুণা বলিল, তাই আশীর্বাদ করো, কাকা। আমরা যেন কোন-রকমে শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারি দিনগুলো।

আরো দুই চারিটি কথাবার্তার পর দাদা, মামা ও কাকা বিদায় লইলেন। রংপুরী, কুমিল্লানী ও বাঁকুড়ানী দরজায় দাঁড়াইয়া আঁচলে চোখ মুছিল।

ভিতরে আসিয়া দেখিল, শ্যামল খাইতে বসিয়া গিয়াছে। উহা-দিগকে দেখিয়া বলিল, আমি না খেলে তো তোমরা খাবে না, তাই তাড়াতাড়ি বসে গেলাম। তোমরাও আর দেরি ক'রো না।

শ্যামল উঠিয়া গেল। বউরা খাইতে বসিল।

অরুণা বলিল, আহা, কি রান্নাই রেঁধেছে?

করুণা বলিল, ঠাকুরটাকে তো আমি বিদেয় করছি এবেলাতেই। আমরা তিনজন থাকতে কি দরকার ঠাকুরের?

বরুণা বলিল, নিশ্চয়ই। ভারি তো কাজ।

দুই

শ্যামল ইতস্তত ছড়ানো জিনিষগুলি সরাইবার চেষ্টা করিতেছে। মনে মনে যেন আহ্লাদে আটখানা। সব জিনিষই তিন প্রস্থ করিয়া। তিনটি ঘড়ি, তিনটি আংটি, তিনটি নূতন ট্রাঙ্ক—বেস্ট ষ্টীল নং ১, ছটা সুটকেশ, তিন প্রস্থ বিছানা, তিন প্রস্থ বাসন। শ্যামল ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছে আর পুলকিত হইতেছে। বধূরাও আসিল। বলিল, এত তাড়া কিসের? এ বেলাটা একটু জিরিয়ে নি। ওবেলা সব ঠিক করে ফেলবো। এখন চলো, একটু বিশ্রাম করি গে।

বধূরা বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেল। শ্যামল জিনিষপত্র লইয়াই ব্যস্ত রহিল। সে আস্তে আস্তে সমস্ত তিন প্রস্থ জিনিষগুলিকে খুলিয়া একত্র করিয়া এক এক প্রস্থে পরিণত করিল। নিজেই টানাটানি করিয়া কতক এঘরে কতক ওঘরে সরাইয়া মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। তারপর হাত-পা ধুইয়া একখানা ইজিচেয়ারের উপরে এলাইয়া পড়িল।

বৈকালের দিকে সকলে বসিবার ঘরটা গুছাইয়া লইল। বধূদের কাপড়-ছাড়া, হাতমুখ-ধোওয়া হইয়া গেলে, অরুণা করুণার পায়ে আলতা পরাইয়া দিল, করুণা বরুণার পায়ে এবং বরুণা অরুণার পায়ে আলতা পরাইল। তেমনি আবার গোল হইয়া বসিয়া অরুণা করুণার, করুণা বরুণার এবং বরুণা অরুণার চুল বাঁধিয়া দিল। শ্যামল বলিল, একটু চায়ের জোগাড় করলে হ'ত।

তিনজনে মিলিয়া চা করিয়া দুধ চিনি চায়ের কাপ প্রভৃতি লইয়া একটি বড় টিপয়ের উপর রাখিয়া চারজনে ঘিরিয়া বসিল। অরুণা চা ঢালে, করুণা দুধ দেয়, বরুণা চিনি মেশায়। শ্যামল বলিল, খাসা চা করেছ তোমরা।

অ—সঙ্গে কিছু আন্‌বো ?

শ্যা—কিছু দরকার নেই। খানকয়েক বিস্কুট হলেই হবে।

করুণা উঠিয়া গিয়া একটি নূতন বিস্কুটের কৌটা একখানি নূতন ছুরি দিয়া খুলিয়া একখানি নূতন প্লেটে করিয়া খানকয়েক বিস্কুট লইয়া টিপয়ের উপর রাখিয়া বলিল, এতেই হবে তো ?

শ্যা—খুব হবে। তুমি বসো।

চারজনে মিলিয়া চা-খাওয়া হইতেছে এবং কথাবার্তা হইতেছে। শ্যামল বলিল, কেমন, বাসাটা পছন্দ হয়েছে তো ? কত খুঁজলাম, এর চেয়ে ভাল তো কিছু জুটল না।

অ—এই তো বেশ হয়েছে। এতেই আমাদের বেশ চলে যাবে।

ক—ছোট ছোট ঘরই তো ভাল। বেশ সাজিযে গুছিয়ে রাখা যায়।

ব—হ্যাঁ, মাত্র চারটি তো প্রাণী, কি হবে মেলা ঘর-বারান্দা। এই তো বেশ।

তারপর চা খাওয়ার সঙ্গে সুরু হইল একথা-সেকথা। রংপুরের কথা, কুমিল্লার কথা, বাঁকুড়ার কথা। কোথাকার লোক কেমন, জিনিষ-পত্রের দাম, কোথায় কোন জিনিষ ভাল পাওয়া যায়, কলিকাতার সুবিধা-অসুবিধা, কোথায় গরম বেশি, কোথায় শীত বেশি, খবরের কাগজে কি লিখিয়াছে, খেলার মাঠে কোন কোন দলে মারামারি হইয়াছে, ইত্যাদি বহু প্রকার বহু কথা হইতে লাগিল।

অরুণা একবার উঠিয়া পাশের ঘরের দিকে যাইতেছে দেখিয়া

শ্যামলের ইচ্ছা হইল, সেও যায় এবং নিরিবিলি অরুণার সঙ্গে একটু কথা বলে। কিন্তু করুণা ও বরুণাকে একা ফেলিয়া গেলে তাহারা কি মনে করিবে, এই ভাবিয়া তাহার আর ওঠা হইল না।

একটু পরে চা-খাওয়া শেষ করিয়া করুণা ও বরুণা উভয়েই বলিল, এবার ওঠা যাক। রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো।

বধূরা উঠিয়া গেল। অরুণা উনুন ধরাইল, করুণা মশলা বাটিল, বরুণা রান্না চড়াইল। গৃহস্থালীর প্রথম দিন আজ। সকলেরই মনে মহা উৎসাহ। রাঁধিবার বেশি কিছু ব্যবস্থা আজ ছিল না। যাহা ছিল তাহাই পরম যত্নে রান্না হইল।

শ্যামল বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে। আজ জীবনের একটা গুরুতর দিন। প্রাথমিক ফাঁড়া তো কাটিয়া গিয়াছে রংপুরে, কুমিল্লায় আর বাঁকুড়ায়। উৎসাহের প্রথম ধাক্কা কাটিয়া গেল, অথচ কাহারো সঙ্গে ভাল করিয়া—। কমন 'এসটাব্লিশমেণ্টের স্থবিধার কথাই শুধু সে ভাবিয়াছে। যাক্, এমন ব্যস্ত হবারই কি!

শ্যামল খাইতে বসিয়াছ। অরুণা জল, লেবু, মুন আগাইয়া দিতেছে, করুণা ভাত বাড়িয়া আনিয়াছে। বরুণা পাখা হাতে করিয়া বাতাস করিতেছে। শ্যামল খাইতেছে, গল্প কবিতেছে আর বলিতেছে, তোমরাও বসে গেলে পারতে।

অরুণা বলিল, এইতো বসছি আমরা তিন জনে এক সঙ্গে। তুমি খেয়ে ওঠ।

তিন

পরদিন সকালে করুণা ও বরুণা আগে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া চায়ের জোগাড় করিতে গেল। শ্যামলও উঠিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজের প্রতীক্ষায় একটি সিগারেট আস্তে আস্তে টানিতে লাগিল।

অরুণার উঠিতে বেশ একটু দেরী হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আসিয়া করুণা ও বরুণাকে বলিল, সত্যি ভাই, ভীষণ ঘুম পেয়েছিল। ইস্, বড্ড বেলা হয়ে গেছে। কাপড়খানা ছেড়ে এই এলাম বলে।

করুণা ও বরুণা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

চায়ের ছোট টেবিলটা মাঝে রাখিয়া গোল হইয়া বসিয়া খবরের কাগজ পড়া এবং চা খাওয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার গল্প। অরুণা মাঝে মাঝে হাই তুলিতে লাগিল।

চা-খাওয়া শেষ হইয়াছে। উহারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। আবার রান্নার ব্যবস্থা চাই তো। শ্যামলের অফিস সাড়ে দশটায়।

এ প্রভাতটা শ্যামলের জীবন-প্রভাত। আজ সে বুঝিল, এটা আর আগের সে মেস নয়, এটা একটা বাড়ী। আজ সে গৃহস্থ হইয়াছে। তার আপনার জন হইয়াছে। তার কাজের, তার অফিসের কর্তব্যের একটা অর্থ হইয়াছে। এতদিনে জীবনের একটা মানে পাওয়া গেছে।

শ্যামল বসিয়া ভাবিতেছে, স্বপ্ন দেখিতেছে।

অরুণা আসিয়া বলিল, যাও মুখ-টুখ ধোও গে। করুণা আসিয়া বলিল, যাও দাড়ী কামাও গে। বরুণা বলিল, স্নানের সময় কিন্তু হয়ে এল।

মুখ ধুইয়া, দাড়ী কামাইয়া শ্যামল স্নান করিতে গেল। অরুণা তেলের শিশি আগাইয়া দিল, করুণা একখানা তোয়ালে আনিয়া শ্যামলের কাঁধে রাখিয়া দিল, বরুণা একখানি নূতন সাবান নূতন সোপকেসে রাখিয়া শ্যামলেব হাতে দিল।

স্নান শেষ হইতেই অরুণা একজোড়া স্যাণ্ডাল পায়েব কাছে আনিয়া রাখিল, করুণা আনিয়া দিল চিরুণী, আর বরুণা একখানি ছোট আয়না লইয়া সামনে ধরিল।

শ্যামলের খাওয়া শেষ হইবামাত্র অরুণা নূতন একটি জাগে জল ভরিয়া তাহার হাতে আস্তে আস্তে ঢালয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, পেট ভরেছে তো? রান্না কেমন হয়েছিল? মেসের ঠাকুরের চেয়ে ভাল না মন্দ?

এক গাল হাসিয়া শ্যামল বলিল, কি যে বল? কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা।

মুখ ধোওয়া শেষ হইবামাত্র করুণা একটি পান এবং বরুণা একটি সিগারেট আনিয়া বলিল, কোন্‌টা আগে খাবে?

একটা খেলেই হ'ল। আমার কাছে পানও যা, সিগারেটও তাই।

তাই নাকি?

নিশ্চয়ই।

শ্যামল পান চিবাইতে চিবাইতে সিগারেট ধরাইল।

অফিসের সময় হইয়াছে। শ্যামল আলনার কাছে দাঁড়াইতেই অরুণা আসিয়া একখানি নূতন জরিপাড় ধুতি তাহার হাতে দিল, করুণা আনিয়া দিল একটি সিল্কের পাঞ্জাবী। বরুণা তাড়াতাড়ি তাহার বাক্স খুলিয়া চারটি সোনার বোতাম আনিয়া পরাইয়া দিল পাঞ্জাবীর বুকের ঘরগুলিতে।

অরুণা আগাইয়া দিল নূতন পাম্পসু, করুণা একখানি ভয়েলের রুমাল লইয়া গুঁজিয়া দিল পাঞ্জাবীর বুকে। তারপর বরুণার হাত হইতে একটি নূতন ছাতা লইয়া শ্যামল তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া নামিল বাস ধরিতে।

দোতলা বাসের সামনের আসনে বসিয়া নাচিতে নাচিতে শ্যামল অফিসে যায়। টেবিলে গুন গুন করিয়া গান গায়। টিফিন ঘরে গিয়া আরাম করিয়া সিগারেট খায়। ঘড়ির কাঁটা যেন বড় আস্তে চলে। সময় শেষ হইতেই অফিস হইতে বাহির হয়। এক মিনিটও দেরী করে না।

ট্রামে বাসে স্থান নাই। কিন্তু দেরীও তো করিবার যো নাই। একখানি বোঝাই ট্রামের পাদানিতে ঝুলিতে ঝুলিতে চলে শ্যামল। তবু কি আনন্দ তার মনে!

বাসার কাছে ট্রাম হইতে নামে। মোড়ের দোকান হইতে কেনে এক বাক্স চকলেট্, এক ঠোঙা ডালমুট্, এক ঠোঙা চানাচুর, আর ফুলের দোকান হইতে বাছিয়া বাছিয়া তিনটি বড় গন্ধরাজ ফুল।

বোঁ করিয়া বাসায় ঢোকে, সোঁ করিয়া উপরে ওঠে। পায়ের সাড়া পাইয়া অরুণা আসে, করুণা আসে আর আসে বরুণা। শ্যামল তিনজনের হাতে তিনটি জিনিষ দেয় একটু হেসে হেসে। জিনিষ হাতে করিয়া পিছন ফিরিতেই তাহাদের খোঁপা টানিয়া ধরিয়া গুঁজিয়া দেয় এক একটা গন্ধরাজ ফুল।

চার

চার জনের জীবন চলে স্বচ্ছন্দ গতিতে।

অরুণা, করুণা আর বরুনা বেশ সুখেই আছে। আনন্দ? তা আনন্দেরই বা অভাব কি? কিন্তু, তবু একটা কিন্তু মাঝে মাঝে উঁকি দেয় তাদের মনে। দাঁতের ফাঁকে ছোট একটু সুপুরির কুচি আটকাইয়া গেলে, তাহাতে হাসিবার, কথা কহিবার, খাইবার কোনই অসুবিধা হয়তো হয় না, কিন্তু তবু সেটা সরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত একটা অস্বস্তি লাগিয়াই থাকে। ঠিক তেমনি ইহাদের জীবনযাত্রা বেশ সহজ ও সরল হইলেও ইহাদের মনের কোণে যেন কোথায় একটু কি আটকাইয়া আছে, যাহার জন্য ইহাদের সব আনন্দ, সব কাজের মধ্যেও একটা নিগূঢ় অস্বস্তি জাগিয়া উঠে।

সেদিন চাকর যখন বাসন মাজিতেছিল, হঠাৎ একখানি থালা তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল! ঝন ঝন শব্দ শুনিয়া অরুণা ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, থালাখানি তাহারই পিত্রালয়ের এবং তাহার একপাশ খানিকটা ফাটিয়া গিয়াছে। মুখখানি একটু ভার করিয়াই বলিল, এসে অবধি তো আমার বাসনেই সব হচ্ছে। এমনি করে যেতে থাকলে, আর কদিন পরে কিছুই থাক্‌বে না।

করুণা বলিল, বাসন তো সব এক জায়গাতেই রয়েছে। ওর আর তোমার আমার কি?

অ—তা তো বলবেই, তোমার থালি তো আর ভাঙে নি।

বরুণাও আসিয়া তর্কে যোগ দিল।

কয়েকদিন পরে দেখা গেল একটা বাসনে-নাম-লেখার লোক ডাকিয়া সব বাসনগুলিতে ‘অ’, ‘ক’ এবং ‘ব’ লেখা হইয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে হিসাব করিয়া বাসন লইয়া ব্যবহার করা হইতেছে।

কিছুদিন পরে। অরুণা স্নান করিতে যাইবার সময়ে আলনায় নিজের সাড়ীখানি দেখিতে না পাইয়া অনুসন্ধান করিতেই দেখা গেল, করুণা সেখানি পরিয়া রান্না করিতেছে। অরুণা একটু রুক্ষস্বরেই বলিল, আমার ঐ দিশী সাড়ীখানা না পবে কি রান্না করা চলতো না?

করুণা বলিল, আমার কাপড়খানা তখনো শুকোয় নি, তাই এখানা পরেছি। আমার কাপড়খানা এতক্ষণে শুকিয়েছে বোধ হয়। তুমি বরং ওখানাই পর এবেলা।

বয়ে গেছে আমার পরের কাপড় পরতে, বলিয়া অরুণা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। অগত্যা করুণা তাহার কাপড় বদলাইয়া পুনরায় রান্নায় মন দিল।

তিন দিন সারা দুপুর বসিয়া বসিয়া উহারা নিজ নিজ সাড়ী, ব্লাউজ প্রভৃতিতে সূতা দিয়া নিজ নিজ নাম শেলাই করিয়া লইল।

দিন যায়। একদিন বিকালে অরুণার ছোট ভাই বেড়াইতে আসিল একটি সুটকেশ হাতে করিয়া। তিন দিদিতে মিলিয়া তাহাকে আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিল। বাসা করিবার পর এই প্রথম কুটুম্ব-সমাগম। গল্প করিয়া হাসিয়া, মাঝে মাঝে ঠাট্টা তামাসা করিয়া কয়দিন বেশ কাটিল।

একদিন ভাঁড়ার দিবার সময়ে করুণা বলিল, ডাল তো নেই। শিগগির হরিটাকে পাঠিয়ে দাও তো, নিয়ে আসুক পাঁচপোয়া মুসুরির ডাল।

বরুণা একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিল, কি করে আর থাকবে?

আত্মীয় কুটুম্ব লোকের এসে থাকে। তাই বলে এমন! সেই কবে এসেছে।

ছিঃ, বরুণা, ওকি আমাদের পর? অরুণার ভাইও যে, আমাদের ভাইও সে। আহা! আমার যদি অমন একটা সোনার চাঁদ ভাই থাকতো।

থাক, আর অত দরদে কাজ নেই। আমার ভাই আছে তিন তিনটে! বয়ে গেছে আমাব তাদের ডেকে আনতে তোমাদের এই সংসারে।

অরুণা এই কলহ সম্পূর্ণ না শুনিলেও, অনেকটা তাহার কানে গিয়াছে। সে সেই দিনই দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর তাহার ভাইটিকে বাড়ী পাঠাইয়া দিল। বিকালে শ্যালককে দেখিতে না পাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই, অরুণা বলিল, অনেক দিন এসেছে, আর থাকতে চাইলে না। *

তা, এমন হঠাৎ আমাকে না বলে কয়ে চলে গেল? ছেলে মানুষ, দিদির কাছে এসেছে। না হয়, আর দুটো দিন থাকতো। যাবার সময়ে দু' একটা টুকিটাকি জিনিষও তো কিনে দিতে পারলুম না।

শ্যামল একটু গম্ভীর হইয়া গেল। কাপড় চোপড় ছাড়িয়া বাহিরের ঘরে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। করুণা চা দিতে আসিয়া তাহার গাম্ভীর্য লক্ষ্য করিল। সেখানে কোন কথা না বলিয়া ভিতরে আসিয়া বরুণাকে বলিল, দেখলে তো! এরই মধ্যে চুকলি কাটা হয়েছে। আমরা নাকি জোট করে ওঁর আদরের শালাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

কে বল্‌লে?

বলবে আবার কে? সব কথাই কি আবার চেঁচিয়ে পাড়ার লোক ডেকে সাক্ষী রেখে বলতে হয়? আমরা আর কিছু বুঝিনে যেন!

পাঁচ

রংপুর হইতে অরুণার মাতাঠাকুরাণী পত্র লিখিয়াছেন—বাবা শ্যামল, শুনিলাম, অরুণার শরীর তেমন ভাল নাই। ছেলেমানুষ। আমার বিশেষ ইচ্ছা সে এখন কিছুদিন আমার কাছে থাকে। তোমার সম্মতি পাইলেই তাহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইব। বাবা তুমি অমত করিও না। অরুণা চলিয়া আসিলেও করুণা ও বরুণা তো থাকিবে। তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। সত্বর পত্রের উত্তর দিও। ইতি আশীর্বাদিকা অরুণার মাতা।

শ্যামল সম্মত হইয়া পত্রের উত্তর দিয়াছে। অরুণার এক পিসতুত ভাই তাহাকে লইয়া গিয়া রংপুর রাখিয়া আসিয়াছে।

শ্যামলের মনটা একটু যেন কেমন বিমর্ষ হইয়াছে। যথাসম্ভব এই ভাবটা অগ্রাহ্য করিতে ও ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন আনমনা হইয়া পড়ে। হিসাবমত মনের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র উদ্বিগ্ন হইবার কথা। কিন্তু কার্যত যেন সব মনটাই আহত হইয়াছে মনে হয়।

করুণা ও বরুণা দেখে, বোঝে, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে চায় না।

সেদিন সকালে শ্যামল চা খাইতেছে। তুই এক চুমুক খাইয়াই বলিল, চা-টা যেন একটু তেতো লাগ্‌ছে, একটু বেশি কড়া হয়ে গেছে বোধ হয়।

করুণা বলিয়া উঠিল, তেতো চা খেতে সাধছে কে? যার হাতের চা মিষ্টি লাগে, তাকে আনিয়ে নিলেই হয়।

কি যে বল! আমি কি তোমার দোষ দিচ্ছি নাকি?

নাঃ, দোষ দেবে কেন, গুণ গাইছ।

অফিসের সময় হইয়াছে। শ্যামল খাইয়া উঠিয়া কাপড়-জামা পরিতেছে। রুমাল খুঁজিয়া না পাইয়া বরুণাকে ডাকিয়া বলিল, একখানা রুমাল দাও তো।

বরুণা একখানি রুমাল আনিয়া দিল, অত্যন্ত ময়লা। দেখিয়া শ্যামল বলিল, একখানা পরিষ্কার রুমাল নেই? একটু সাবান দিয়ে ধুয়ে রাখতেও তো পার।

পারব না তোমার ধোপার কাজ করতে।

সে কি? রুমাল তো বরাবরই অ—মানে তোমরা বাড়ীতেই পরিষ্কার করে থাক।

আর পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ কেন? যে তোমার রুমাল পরিষ্কার করত, তাকে আনিয়ে নিলেই তো হয়।

আচ্ছা, তোমাদের কি হয়েছে বল তো? যে এখানে নেই, সব সময়ে তাকে খুঁটে কথা বলে লাভ কি?

ইস্, বড় যে লাগল দেখ্ছি। আমার কথা শুনলেই তো তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ে।

কি যে বল! কোন দিন তোমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেছি?

নাঃ, খাসা ব্যবহার করছ। থাক, আর কথা বাড়িও না। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

কোন মতে অফিসের কাজ সারিয়া বাড়ী আসিয়া শ্যামল একখানা

চেয়ারে গা এলাইয়া দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। করুণা চা লইয়া আসিয়া বলিল, অফিস থেকে ফিরেছ। তেতো চা-ই একটু খাও। আর একটা কথা বলি শোন। এমন করে হেদিয়ে না মরে, যাও, অফিস থেকে ছুটী নিয়ে, একবার রংপুর ঘুরে এস।

আচ্ছা, তোমরা এমন করে আমার পিছনে লাগলে কেন বল তো? তোমরা কি আমার কেউ নও? আমি তো তোমাদের মাঝে কখনো কোন প্রভেদ করি নে। তোমরা শুধু শুধু বানিয়ে বানিয়ে এমন অশান্তি কেন কর বল তো?

আর বক্তৃতায় কাজ নেই। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

চা রাখিয়া করুণা চলিয়া গেল। শ্যামল চা খাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল!

রাত্রে শ্যামল খাইতে বসিয়াছে। করুণা রাঁধিয়াছে। বরুণা পরিবেষণ করিতেছে।

খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে। বরুণা বলিল, আর দুটো ভাত এনে দি।

শ্যামল বলিল, না, আর খেতে পারছি নে।

কেন? ভাত তো বেশি নাও নি। নিয়ে আসি আর দুটো।

না, না। আমার তেমন খিদে নেই।

তা আর থাকবে কেমন করে বল? খিদে নেই, ঘুম নেই, হাসি নেই। এমন করে কত দিন চলবে?

-শা।<~ ~. বল! রোজই মানুষের শরীর ঠিক একরকম থাকে? একটু

করুণা ও' 'তে নেই? শরীর তো আমার ভালই আছে। তোমরা

সেদিন স্ত হও কেন?

বলিল, চা-টা' আচ্ছা, হব না ব্যস্ত। নাও, এই ভাত কটা খেয়ে ফেল।

বোধ হয়। ;খি পান সাজা নেই বোধ হয়।

আহারের পর একটু বিশ্রাম করিয়া শ্যামল শুইতে গিয়া দেখে, তাহার মশারিটা ফেলা হয় নাই। অসংখ্য মশা ভন্‌ ভন্‌ করিতেছে। শ্যামল বরুণাকে বলিল, মশারিটা অমনি পড়ে রয়েছে আজ।

বরুণা বলিল, পারবো না তোমার মশারি ফেলতে। রোজ রোজ দশ পাতা করে যার কাছে কাব্যি করে চিঠি লেখা হয়, তাকে লিখে দাও, এসে মশারি ফেলে দিয়ে যাবে।

থাক, যথেষ্ট হয়েছে।

পরদিন। শ্যামল অফিস হইতে ফিরিবার সময়ে একটি প্যাকেট লইয়া বাসায় ঢুকিল।

প্যাকেটটি টপ করিয়া হাতে লইয়া করুণা বলিল, এতে কি?

ও একখানা সাড়ী।

কার জন্য?

শ্যামল একটু ঢোক গিলিয়া বলিল, রংপুর থেকে একখানা চিঠি এসেছিল, মানে—লিখেছে যে তার কাপড় ছিঁড়ে গেছে। তাই ভাবলুম—

তা তো ভাববেই। রংপুরের লোকদেরই খালি কাপড় ছেঁড়ে, কলকাতার লোকদের আর কাপড় ছেঁড়ে না। আমাদের কাপড় সব লোহার তার দিয়ে বোনা কিনা।

কি মুস্কিল। তোমাদের যখন দরকার হয়, বলো আমাকে।

মুস্কিলই তো। আমাকে নিয়েই তোমার যত মুস্কিল, আর কাউকে নিয়ে কোনই মুস্কিল নেই।

শ্যামল কোন কথা বলিল না। দেখ, পার তো একটু চায়ের ব্যবস্থা কর—বলিয়া কাপড় ছাড়িতে গেল।

ছয়

কিছুদিন পরের কথা। শ্যামল বৈকালে বাসায় ফিরিয়া দেখে বরুণা গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মুখখানি বিষণ্ণ ও গম্ভীর। শ্যামলের উপস্থিতি সম্বন্ধে তাহার কোন চেতনাই যেন নাই।

শ্যামল কাপড় জামা ছাড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অমন করে বসে আছ, হয়েছে কি? করুণা কই? ঝগড়া করেছ বুঝি আবার?

কোন উত্তর নাই।

শ্যামল পুনরায় বলিল, কি, একেবারে কথাই বলছ না যে। কি, কি হয়েছে বল না? একটু চা-টায়ের জোগাড় করবে না? গলাটা যে শুকিয়ে গেছে।

কোন উত্তর নাই। বরুণা তেমনি চুপ করিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। শ্যামল কাছে গিয়া একটু আদর করিবে মনে করিতেছে, এমন সময়ে বরুণা মুখে আঁচলের খুঁট গুজিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শ্যামল অত্যন্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে, বল না? কোন খারাপ চিঠিপত্র এসেছে?

কোন উত্তর নাই। শুধু ফুঁপাইয়া কান্না।

শ্যামলের জিজ্ঞাসা ও কাকুতি মিনতি যখন প্রায় অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন বরুণা আস্তে আস্তে ধরা গলায় বলিল, করুণা আমাদের ছেড়ে গেছে।

সে কি। কেমন করে? বিষ টিষ—

না গো, না। বিষ টিষ নয়। ছ্যাকরা গাড়ী করে চলে গেছে।

কোথায় ?

জানি না।

কিছু বলে যায় নি ?

না। দুপুর বেলায় একটু গড়াচ্ছি, এমন সময়ে দেখি করুণা তাড়াতাড়ি তার কাপড় চোপড় গুলো বাক্স থেকে বের করে একটা পুঁটলি বাঁধল আর গয়না-পত্র যা ছিল সব একত্র করে সেই পুঁটলিতে রাখল। তারপর সেই পুঁটলি নিয়ে তর তর করে নেমে গেল নীচে। সিঁড়ি থেকে আমাকে ডেকে বলে গেল, আমি চললুম। এ জন্মে আর দেখা হবে না। ওঁকে বলো, আমার জন্য যেন কোন রকম খোঁজ খবর না করেন। আচ্ছা, চললুম। আমাকে ক্ষমা করো তোমরা।

কি সর্বনাশ।—বলিয়া শ্যামল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

শ্যামল জিজ্ঞাসা করিল, কার সঙ্গে গেল ?

তা তো দেখতে পেলাম না। ঘোড়ার গাড়ীতে যখন করুণা উঠল, মনে হ'ল গাড়ীর মধ্যে আর যেন কে বসে আছে। গাড়ীর জানলাগুলো সব ছিল বন্ধ।

শ্যামল ও বরুণা সেদিন অনাহারে রহিল।

পরদিন শ্যামল ভাবিতে বসিল। কি করা যায় ? পুলিশে খবর দিবে ? খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিবে ? ছেলে-মেয়ে হারাইলে বা পিসিমা মাসিমা হারাইলে এ সকল ব্যবস্থা চলে, কিন্তু স্ত্রী হারাইলে এ সকল ব্যবস্থা শোভনীয় তো নয়ই, বাঞ্ছনীয় কি না তাহাও বিবেচ্য।

ভাবিয়া ভাবিয়া কোন সমাধান স্থির করিতে না পারিয়া অগত্যা শ্যামল তৈল মাখিয়া স্নান করিতে গেল। এবং আহারাদি করিয়া ধীরে গম্ভীরমুখে অফিস চলিয়া গেল।

শ্যামলদের ফ্ল্যাটের পাশে একখানি দোতলা বাড়ীর বাসিন্দাদের সঙ্গে ইহাদের মৌখিক আলাপ পরিচয় কিছু হইয়াছে। কতদিন কত সময়ে জানালায় বা বারান্দায় দাঁড়াইয়া পরস্পর কথা বলিয়াছে, হাসিয়াছে, গল্প করিয়াছে। এই বাড়ীর একটি বউ বরুণাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, করুণাদি কোথায় গেলেন বরুণাদি ?

শ্যামপুকুরে ওঁর এক মাসী থাকেন, সেখানে গেছেন বেড়াতে।

তা অমন ভর-দুপুরে—কর্তা অফিসে—অমন সময়ে পুঁটলি বগলে করে কেউ মাসির বাড়ী বেড়াতে যায় না কি ?

গেলেন তো দেখতেই পেলেন। এই কথা বলিয়াই বরুণা সেস্থান ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পাশের বাড়ীর বধূটি একটু হাসিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

শ্যামল অফিস হইতে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু তাহার মন ও মুখ যেমন অপ্রসন্ন ছিল, তেমনি রহিল।

দিন যাইতে লাগিল। বরুণা কত সান্ত্বনা দেয়, কত বুঝায়, কোনই ফল হয় না। শ্যামল কথা বলে না, নিতান্ত হুঁ, না ছাড়া। কাজেই বরুণারও কথা বন্ধ। শ্যামল হাসে না, কাজেই বরুণারও হাসি নাই, গল্প নাই, কোথাও বেড়াইতে যাওয়া নাই। কলের পুতুলের মত কোনমতে চলাফেরা, খাওয়া, ঘুমান, অফিস যাওয়া, বাড়ী ফেরা।

সাত

কিছুদিন পরে। শ্যামল অফিস হইতে ফিরিয়াছে। বাহিরের দরজা ছিল ভেজান। দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখে, সমস্ত ফ্ল্যাটটা একেবারে নিস্তব্ধ। ঘরে ঢুকিয়া দেখে, বরুণা বিছানায় শুইয়া আছে—কিন্তু একেবারে অস্বাভাবিকভাবে। উপুড় হইয়া শোয়া—হাত ঝুলিয়া পড়িযাছে খাটের পাশে, মাথাটার অর্ধেকটা খাটের উপর, মুখে ফেনা।

শ্যামল দৌড়িয়া কাছে গেল। নিস্পন্দ অসাড় দেহখানি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল খাটের উপর।

ঠিকা ঝি বৈকালে আসিয়াছে কাজ করিতে। ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া ছুটিয়া পলাইল।

বিছানায় একখানা চিঠি পাওয়া গেল। তাহাতে বরুণা লিখিয়াছে, প্রিয়তম, আমাদের জীবন যে ভাবে চলিতেছিল, সে জীবনের কোন অর্থ হয় না। যে জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল, এবং সব মেয়েরই থাকে, তাহা আমি পাই নাই, পাইবার কোন আশাও নাই। প্রত্যহ পলে পলে মৃত্যু অপেক্ষা একবার মৃত্যুই শ্রেয় মনে করিলাম। আমার মৃত্যুর জন্য অপর কেহ দায়ী নয়। আমাকে ক্ষমা করো। ইতি, তোমারই বরুণা।

পুলিশের অনুসন্ধান প্রভৃতি শেষ হইল। বরুণার দেহ ও চিঠি লইয়া পুলিশ প্রস্থান করিল।

পরদিন দেখা গেল শ্যামলের ফ্ল্যাট শূন্য। শ্যামলের অফিসে শ্যামল

অনুপস্থিত। ইহার পর রংপুর হইতে অরুণা বহু পত্র লিখিয়াও কোন উত্তর পাইল না।

শ্যামলের পাশের বাড়ীগুলিতে বহু অনুসন্ধান সত্বেও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। শুধু জানা গিয়াছে যে, একদিন প্রত্যুষে একটি ছোট কম্বল মোড়া বিছানা ও একটি কাঁসাব ঘটি সম্বল করিয়া সে হাওড়াগামী বাসে উঠিয়াছিল!

আট

দশ বৎসর পরে।

হরিদ্বারে গঙ্গার তীরে একটি সাধুর আখড়া। ছোট একখানি কুটীর! কুটীরের পাশে ধুনি জ্বলিতেছে। ধুনির পাশে গায়ে ভস্মমাখা একটি সাধু বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছেন কয়েকটি নরনারী, সাধুর কৃপালাভের জন্য।

সাধুটির নাম বম্-হরনাথ। পূর্বাশ্রমের নাম শ্যামল। বুদ্ধ, চৈতন্য এক একটি স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া ভুবনবিখ্যাত হইয়াছিলেন, শ্যামল তিনটি স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া ত্রিভুবন-বিখ্যাত হইবার নিষ্কাম বাসনায় হরিদ্বারে আসিয়া কঠোর তপশ্চর্যা আরম্ভ করিয়াছেন।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বম-হরনাথের নাম এ অঞ্চলে বেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটি শিষ্য সর্বদা তাঁহার কাছে থাকেন। তাঁহার নানাপ্রকার ঐশী শক্তির কথাও লোকে জানিতে পারিয়াছে। কখনও তিনি অণু হইয়া মাটিতে মিশিয়া যান, কখনও লঘু হইয়া আকাশে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যান, আবার কখনও ব্যাপ্তিলাভ করিয়া হরিদ্বার

হইতে দেরাদুন পর্যন্ত নিজেকে নিজে ছড়াইয়া দেন। অবশ্য এই সকল অলৌকিক শক্তি তিনি কখনই প্রকাশ করিতে চাহেন না। তবে ভক্ত বুঝিয়া ও তাহার ভক্তি বুঝিয়া দৈবাৎ কখনও কখনও এক একটি ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়া ফেলেন।

তাঁহার মাথায় বিশাল জটজাল। দাড়ী ঘন ও লম্বা হইয়া প্রায় সমস্ত বুক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। টাট্‌কা সেফটিরেজরে কামানো অফিস-যাওয়া মুখ যে এমন ঋষিসুলভ পবিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, তাহা বম্‌-হরনাথকে না দেখিলে বোঝা যায় না।

সেদিন যে কয়জন নরনারী বম্‌-হরনাথের দর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন একটি যুবতী। বয়স সাতাশ আটাশ হইবে। সঙ্গে একটি দশ এগার বৎসরের বালক! খাসা ফুটফুটে চেহারা। আর একটি বৃদ্ধ, বোধ হয় যুবতীর পিতা।

ইঁহাদের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সাধু বম্‌-হরনাথ হঠাৎ একটু চমকাইয়া উঠিয়া চক্ষু বুজিয়া প্রায় সমাধিস্থ হইলেন। একটি শিষ্য আসিয়া আগন্তুকদিগকে বিনীতভাবে বলিলেন, বাবাজী এখন কারো সঙ্গে কথা বলবেন না। আপনারা অন্য সময়ে আসবেন।

তাঁহারা চলিয়া যাইতেই বাবা বম্‌-হরনাথ একজন শিষ্যকে বলিলেন, দেখে এসো তো, ওই ফুটফুটে ছেলেটি কোথায় থাকে?

নূতন শিষ্যলাভের সম্ভাবনা অনুমান করিয়া এই শিষ্যটি উহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাহারা যে ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আসিয়া বাবাজীকে সংবাদ দিল।

বাবাজী শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা যে ছেলেটিকে দেখেছ, ওটি যে-সে ছেলে নয়। ওর শরীরে ঐশী লক্ষণ প্রকটিত। ওকে সংসার

থেকে সরিয়ে আমাদের আথড়ায় আনতে হবে। কিন্তু তাতে প্রয়োজন হবে আমার তপস্যা, আমার সাধনা। আমি যাব ঐ ধর্ম্মশালায়। থাকবো সেখানে তিন দিন তিন রাত্রি। চতুর্থ দিনে ওই বালক-সন্ন্যাসীকে নিয়ে ফিরবো এই আশ্রমে। তৃপ্ত হবে আমার আত্মা। ধন্য হবে তোমাদের আশ্রম। কিন্তু সাবধান! এই তিনদিনের মধ্যে যেন তোমাদের কারো মুখদর্শন না হয়! কেমন, বুঝ্‌লে তো!

শিষ্যেরা সমস্বরে বলিলেন, আজ্ঞে ঠিক বুঝেছি। চতুর্থ দিনে আপনার আগমনের অপেক্ষায় আমরাও এ কয়দিন কঠোর ব্রত পালন করবো।

বেশ বেশ!—বলিয়া বাবা বম্‌-হরনাথ ধর্মশালা অভিমুখে চলিলেন।

ধর্ম্মশালায় পৌছিয়া উঠানের এদিক ওদিক ভাল করিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইলেন, সেই খোকাটি একটি শাল-পাতায় করিয়া পুরী ও তরকারী খাইতেছে। তিনি একটু সে দিকে অগ্রসর হইতেই খোকা একটু ভয় পাইয়া উঠিয়া পড়িল। ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য তাহার মাতাঠাকুরাণী পার্শ্বস্থ ঘর হইতে বাহির হইতেই, বাবা বম্‌-হরনাথ তাহার কাছে গিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, অরুণা, আমি শ্যামল।

অরুণা তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ঘরে যাইতে বলিল। বৃদ্ধকে বলিল, বাবা, আপনি একটু বাহিরে যান। আমি সাধুজীর সঙ্গে একটু কথা বলবো। বৃদ্ধ বাহির হইয়া গিয়া খোকার সহিত মিলিত হইলেন।

অরুণা বলিল, এর মানে?

মানে আবার কি? সংসার ভাল লাগলো না।

তাই নাকি!—বলিয়া অরুণা বাবাজীর দাড়ী ধরিয়া একটু টান দিল।

আঃ, লাগে।

বলি, এখন তোমার মতটা কি?

মানে, মত বিশেষ কিছু নেই। তবে, সাধু হতেই বা বাধা কি?

বাধা যদি নেই, তবে ধর্ম্মশালা পর্য্যন্ত ধাওয়া করবার দরকার কি ছিল?

এই একটু তোমাদের খোঁজ-খবর নিতে এলাম।

সাধু হয়ে মেয়েমানুষের খোঁজখবর নেওয়া তো ভাল কথা নয়।

তাই বলে স্ত্রী-পুত্রের খবর—

বুঝেছি, তোমার তপস্যার বল কত খানি।

আচ্ছা, করুণার কোন খবর টবর জান? বরুণা তো চলেই গেছে।

ওসব খবর পরে শুনো। এখন টাইম্ টেব্ল্টা দেখো তো সন্ধ্যার পর শাহারাণপুরের দিকে কোন গাড়ী আছে কি না।

আজই?

হ্যাঁ, আজই, এখনই। ভেবেছিলাম এখান থেকে দিল্লী, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন হয়ে ফিরবো, কিন্তু দিলে তুমি সব মাটি করে।

বেশ তো, যাও না মথুরা-বৃন্দাবন।

থাক।

চতুর্থ দিনেও বম্-হরনাথ আশ্রমে ফিরিলেন না দেখিয়া শিষ্যেরা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ধর্ম্মশালায় আসিয়াও কোন সংবাদ পাইল না। নানাস্থানে খুঁজিয়া তাহারা বিষণ্ণ মনে আশ্রমে ফিরিল। তাঁহার অনুগত ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দের মধ্যে নানা প্রকার অনুমান ও

গবেষণা চলিতে লাগিল। কেহ বলিলেন, তিনি মহা-গঙ্গানদীতে মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। কেহ কহিলেন, তিনি গঙ্গোত্রী-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। কেহ বলিলেন, তিনি সমাধির বলে আত্মলুপ্তি সাধন করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে তিনি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের একটি সেলুনে বসিয়া দাড়ী কামাইতেছিলেন।

নয়

যুদ্ধের জের তখনো মেটে নাই। কন্‌ট্রাক্টরদের কাজকর্ম বেশ চলিতেছে। শ্যামল একটা ফার্মে কোনমতে সূচের মত ঢুকিয়া পড়িয়াছে। মনে আশা আছে, ক্রমশ ফাল হইয়া বাহির হইতে পারিবে।

আপাতত একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করা হইয়াছে, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে।

দিনগুলি মন্দ কাটিতেছে না। খোকা ভর্তি হইয়াছে স্কুলে।

শ্যামল একদিন বলিল, চল না, একটা ছবি দেখে আসি ছায়ায়। কতকাল তো ওসব দেখাশুনা হয় নি।

কি ছবি আছে ওখানে ?

কি জানি! একটা হলেই হ'লো। একটু সময় কাটানো বই তো নয়। কে একজন চিত্রিতা দেবী নাকি নায়িকা।

ও! চিত্রিতা দেবী। বেশ চল, দেখে আসি।

তুমি ওর ছবি দেখেছো না কি ?

দেখেছি বৈ কি। অনেক দিন দেখেছি।

শ্যামল ও অরুণা ছবি দেখিতে আসিযাছে। খোকাকে বাসায় রাখিয়া গিয়াছে। শ্যামল তাহাকে সঙ্গে আনিতে চাহিযাছিল, কিন্তু অরুণা আনিতে দেয় নাই।

পর্দায় নায়িকার আবির্ভাব হইতেই শ্যামল বলিল, নায়িকাটি তো বেশ! আচ্ছা, কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে!

তাই না কি!

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন খুব চেনা মুখ।

খুব চেনাই তো। ও হচ্ছে তোমার করুণা।

অ্যাঁ!

কি, মূর্চ্ছা যাবে নাকি?

না-গো-না।

মূর্চ্ছা গিয়েও এখন আর কোন লাভ নেই।

অ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো নেই-ই।

দৃশ্যের পর দৃশ্য বদলাইতে লাগিল। নায়িকার কথা, নায়িকার গান, নায়িকার বাক্যালাপ খুব মনোযোগ দিয়াই শ্যামল শুনিল ও উপভোগ করিল। মনের কোণে কোথায় হয়তো একটু খোঁচা লাগিতেছিল কিন্তু হরিদ্বারের তপোলব্ধ শক্তি দিয়া তাহা নিরাকৃত করিয়া লইল।

ছবি দেখা শেষ করিয়া বাসার দিকে যাত্রা করিল শ্যামল ও অরুণা। অরুণা একথা ওকথা বলিয়া যাইতেছে, কিন্তু শ্যামলের সেদিকে মন নাই। হয়তো ছবির কথা মনে করিয়াই অনেক পুরানো কথা জাগিতেছে তাহার মনে।

বাসার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ একখানি

মোটর জোরে আসিয়া পড়িল প্রায় তাহাদের গায়ের উপর। অরুণা সরিয়া গিয়া বাঁচিয়া গেল, কিন্তু শ্যামলের গায়ে গাড়ীর মাডগার্ডের একটা বিষম ধাক্কা লাগিতে সে মাটিতে পড়িয়া গিয়া অচেতন হইয়া পড়িল।

পাড়ার লোকে ধরাধরি করিয়া এক খানা ট্যাক্সিতে তুলিয়া তাহাকে রাখিয়া আসিল হাসপাতালে। অরুণা বাড়ী আসিয়া খোকাকে লইয়া হাসপাতালে গেল এবং সেখানে শ্যামলকে অনেকটা সুস্থ অবস্থায় দেখিয়া খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী ফিরিল।

যে কয়দিন শ্যামল হাসপাতালে আছে, অরুণা প্রত্যহ যায় তাহাকে দেখিতে। খাবার জন্য এটা ওটা দিয়া আসে। পড়িবার জন্য দিয়া আসে দুই একখানা বই।

একদিন রাত্রে শ্যামল বড়ই অস্থির বোধ করিতেছে। ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে। হয়তো দুই একটি অ্যাস্‌পিরিনের বড়ি খাইতে পারিলে ভাল হইত। কাছে কেহ নাই। অনেক কষ্টে একটি চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নিকটে কোন নার্স আছে কি না। সে বলিল, নিকটে তো কেউ নেই, তবে পাশের ওয়ার্ডে একটি নার্স এখনও জাগিয়া বসিয়া আছেন। সেখানে একটি খারাপ রোগী আছে। শ্যামল অনেক অনুনয় করিয়া চাকরটিকে বলিল, তোমার ওই দিদিমণিকে একটু ডেকে দিতে পার?

একটু বিরক্ত হইয়াই চাকরটি দিদিমণিকে ডাকিয়া আনিল। ঘর অন্ধকার। অন্য রোগীর অসুবিধা হইবে বলিয়া ঘরের ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালা হইল না। নার্স একটি ছোট টর্চ জ্বালাইয়া শ্যামলের মুখের উপর ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে ডেকেছেন কেন?—বলিয়াই টর্চ নিভাইয়া দিল।

একটু থামিয়া পুনরায় টর্চ জ্বালিয়া বলিল, তুমি এখানে? কি হয়েছে তোমার?

শ্যামল বলিল, কে তুমি? বরুণা? তুমি বেঁচে আছ?

বরুণা টর্চ আবার নিভাইয়া দিল। শ্যামল বলিল, ভয়ানক মাথা ধরেছে। শিগ্‌গির একটা অ্যাস্‌পিরিন ট্যাসপিরিনের ব্যবস্থা কর।

বরুণা তাড়াতাড়ি দুইটি বড়ি আনিয়া শ্যামলকে খাওয়াইয়া দিয়া তাহার বিছানার পাশেই বসিয়া পড়িল।

শ্যামল একটু সুস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি বেঁচে আছ?

হ্যাঁ। সেদিন থানায় যাবার পর দারোগাবাবুর কেমন সন্দেহ হ'লো আমি একেবারে মরিনি। পাঠিয়ে দিলেন হাসপাতালে। শেষ রাত্রে সত্যি জ্ঞান হ'লো আমার। পরদিন সকালে তোমাকে খবর দিতে গিয়ে শোনা গেল, তুমি, লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছ।

তারপর?

তারপর আর কি? বাড়ী ফিরতে আর ইচ্ছে করল না। তারপর তো দেখতেই পাচ্ছ। তোমার খবর কি?

শ্যামল তাহার খবর বলিল। খবর শেষ করিয়া বলিল, এবার চল ফিরে আমাদের বাসায়।

বরুণা হাসিয়া বলিল। কি যে বল!

কেন, ক্ষতি কি?

লাভ কি?

দুইজনে পরস্পরের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। বোধ হয় শ্যামলের বুকে একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস জমিয়া উঠিল, কিন্তু হরিদ্বারের তপশ্চর্যা হেতু তাহা প্রকট হইল না। বরুণার মনটাও একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল বৈ কি!

একটু পরে দেখা গেল, কে একজন ধীরে ধীরে তাহাদের দিকে আসিতেছেন। বরুণা বলিল, ওই আস্‌ছেন ডক্টর চক্রবর্ত্তী। গিয়েছিলেন আমার ওয়ার্ডে, সেখানে আমাকে না পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছেন। উঃ, কি হিংসুটে। কোন রোগীর কাছে একটু বসতে দেখলে ওঁর গা জ্বলে যায়। আচ্ছা, আমি উঠি এখন। তুমি তো প্রায় সেরে গেছ। আসবো আবার অন্য সময়ে। আমি তো জানতুম না, তুমি আছ এখানে।

বরুণা ডঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল। শ্যামলের মনটা একটু মোচড় দিয়া উঠিল। কিন্তু হবিদ্বারের তপস্যা এবং বরুণার দেওয়া অ্যাসপিরিনের ফলে আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িল।

আগষ্ট, ১৯৪৬

পথ

এ স্থানটায় এতদিন ছিল একটা শালবন।

কিছুদিন হইতে এ স্থানটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বড় একটা রাস্তা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

বড় বড় গাছ কাটিয়া সরাইয়া ফেলা হইতেছে। উঁচুনীচু স্থানগুলিকে কাটিয়া ও মাটি ভরিয়া সমান করা হইতেছে। বহুদূর হইতে লরী বোঝাই ইট, খোয়া, পাথরকুচি, আরও কত কি আসিতেছে। গোটা দুই প্রকাণ্ড রোলার একস্থানে আনিয়া রাখা হইয়াছে। একদল ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসীয়র ও অন্যান্য কর্মচারী সর্বদা ঘোরাফেরা করিতেছে।

যেখানে পথ ছিল না, সেখানে পথ হইতেছে। যেখানে কখনও কোন মানুষ যাতায়াত করে নাই, সেখানে বহুলোক যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। অজ্ঞাত স্থানটি সহসা অতিশয় পরিচিত হইয়া উঠিতেছে। নির্জন বনস্থল কলরবমুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

এপাশে ওপাশে কয়েকটি তাঁবু পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে বাস করেন কয়েকটি কর্মচারী আর মজুত থাকে নানাপ্রকার কাগজপত্র আর যন্ত্রপাতি। কয়েকটি টিউব-ওয়েল বসান হইয়াছে, প্রয়োজনীয় জলের জন্য।

প্রকৃত পরিশ্রমের কাজ যাহারা করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা অগণিত। ইহাদের মধ্যে আছে পুরুষ, আছে নারী, আছে বালক বালিকা। ইট

বহা, মাটি কাটা, জল তোলা, গাছ কাটা, রোলার টানা, প্রভৃতি কত রকমের কাজ। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বহু পুরুষ ও বহু নারী মিলিয়া নিজেদের শরীরের সকল শক্তিটুকু ব্যয় করিয়া তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে এই পথ। এই পথে নরনারী গমন কবিবে, বালক বালিকা গমন করিবে, গরুর গাড়ী, রিক্‌শ, মোটর গাড়ী চলিবে। কত অপরিচিতের সঙ্গে কত অপরিচিতেব সাক্ষাৎ হইবে ক্ষণেকেব জন্য। এই পথ বাহিয়া কেহ যাইবে আনন্দের গান গাহিতে গাহিতে, আবার কেহ যাইবে করুণ বিলাপ করিতে করিতে। এই পৃথিবীর, এই সমাজের কত সুখ, কত দুঃখ বহিয়া যাইবে, ভাসিয়া যাইবে, এই পথেব বুকের উপর দিয়া।

এই নূতন পথের কাজে যাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আছে একটি ক্ষুদ্র পরিবার—রামু, রামুব মাতা, আর রামুর স্ত্রী শোভা। রামুর শরীরটা যেন মানুষের শরীরই নয়, কাল পাথরের মূর্ত্তি যেন। নিকষ কাল, পেশীবহুল সুস্থ, সবল, যৌবনদীপ্ত দেহখানির দিকে যাহারই দৃষ্টি পড়ে, সেই তাকাইয়া থাকে। কাজ করে অসুরের মত। তাহারই মত অন্য শ্রমিকরা যে কাজ করে একদিনে, রামু তাহা শেষ করে একবেলায়। বেশী কাজ করিতে পারে বলিয়া, তাহার আয়ও বেশী। পুত্রের দিকে চাহিয়া মাতার বুক আনন্দে ভরিয়া উঠে। স্বামীর দিকে চাহিয়া শোভার মন গর্বে উচ্ছ্বাসিত হয়। সহকর্মীরা শ্রদ্ধা করে, হয়তো মনে মনে একটু হিংসাও করে।

পথের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রামুদের সাংসারিক অবস্থারও উন্নতি হইতে থাকে। দিনের পর দিন যেমন প্রশস্ত পথটির স্বকীয় রূপ ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তেমনি রামুদের কুটিরখানিও ক্রমশঃ শ্রীসম্পন্ন হইতে থাকে। গৃহখানি বেশ ভাল করিয়া পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। চারিদিকে

একটা বেড়া দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি ফুলগাছও রোপণ করা হইয়াছে। প্রকৃতির শোভা, কুটিরের শোভা একত্রিত হইয়া শোভার সংসারের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। নূতন পথ হইতে বেশী দূরে নয়। ছোট একটি পল্লী। প্রায় সকলেই এই পথে কোন না কোন একটি কাজ করে। সকলেরই অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা একটু স্বচ্ছল হইয়াছে। তবু রামুই যেন এদের মধ্যে সব চেয়ে সুখী।

শোভাব কুটিবের শোভা বর্দ্ধন করিতে নূতন অতিথির আগমন-সম্ভাবনা হইযাছে। বামুব উৎসাহ বাডিযা গিযাছে। শোভা কাজে যাওয়া বন্ধ করিযাছে। বামুর মা আনন্দে পাড়াষ পাড়ায় ঘুরিয়া পুত্রবধূব সুখস্বাচ্ছন্দের উপকরণ খুঁজিযা বেড়াইতেছে। একটা আশা, একটা আনন্দ, একটা তৃপ্তিব স্নিগ্ধ বাতাসে কুটিরখানির অন্তর ও বাহির ভবিয়া উঠিযাছে।

দুই

সেদিন মাতা ও বধূ সারাদিন নানাবিধ আয়োজন করিয়া নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছে। স্থানীয় রীতি অনুসারে আজ তাহারা এবং তাহার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীরা একত্র বসিয়া প্রীতিভোজন করিবে আর অনাগত মানুষটিকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।

রামু কর্ম্মস্থল হইতে বাড়ী ফিরিল একটু যেন বিষণ্ণ মুখে। সে নিজে যথাসাধ্য তাহার বিষণ্ণতা ও অবসাদ চাপিয়া রাখিল। শোভা বার বার জিজ্ঞাসা করিলেও সে জানাইল, ও কিছু না, এমনি।

ক্ষুদ্র কুটিরের ক্ষুদ্র উৎসব শেষ হইয়াছে। রামুকে একান্তে পাইয়াই শোভা জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে তোমার ?

বিশেষ কিছু না, শরীরটা তেমন ভাল নেই।

শোভা রামুর গায়ে হাত দিয়া দেখিল, আগুনের মত গরম। সে বলিল, একি ! গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, জ্বর হয়েছে।

ইহার পরের সংবাদে নূতনত্ব কিছু নাই। কয়েকদিন খুব জ্বর হইল। ক্রমশ জ্বর কমিল, কিন্তু ছাড়িল না। অল্প জ্বর গায়ে লইয়াই কাজ করিতে গেল। শরীরের পেশীগুলি যতদিন সহ্য করিতে পারিল, ততদিন কাজ চলিতে লাগিল। যখন অসুখ আরও বাঁকিয়া বসিল, তখন একদিন একখানি ইটের লরীতে বসিয়া সুদূর সহর হইতে এক শিশি ঔষধ লইয়া আসিল। কিছুদিন চিকিৎসার প্রহসন চলিল। রামুর মা নিকটস্থ মন্দিরের পুরোহিত মহাশয়ের নিকট হইতে একটি মাদুলী আনিয়া উহার হাতে বাঁধিয়া দিল। নিয়তি হাসিতে লাগিলেন। পাথরের কোঁদা নিকষ কাল অসুরের মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইতে লাগিল। মাতা ও বধূ উদ্বেগে আকুল হইয়া অসহায় ভাবে তথাকথিত করুণাময় পরমেশ্বরের কাছে তাহাদের মিনতি জানাইল।

করুণাময় করুণা করিলেন না।

একদিন মাতার ও বধূর শত অনুনয় উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতে গিয়া হঠাৎ রক্ত বমি হইয়া পথের মাঝখানে একটি বালির ঝুড়ি সমেত পড়িয়া গেল। আর উঠিল না।

মাতা আসিয়া উন্মাদিনীর মত পথের মাঝখানে "বাবা আমার" বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। কুটিরে ফিরিয়া দেখিল পাড়ার কতকগুলি মেয়ে-পুরুষ জড় হইয়াছে তাহাদের আঙিনায়। গৃহের মধ্যে শোনা

যাইতেছে নবাগত শিশুর অস্ফুট ক্রন্দন। আর মাতা, তাহার একটু পরে কাঁদিলেও কাহারও ক্ষতি হইবে না।

তিন

ইহার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যেমন করিয়া কাটিবার কথা, ঠিক তেমনই করিয়া কাটিয়াছে। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছে, শাশুড়ী ও পুত্রবধূ কোন মতে তাহা দিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়াছে, শিশুটিকে পালন করিয়াছে। রামুর মা পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই কেমন যেন হইয়া গিয়াছে। তাহার কথায় কাজে কেমন একটা অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়াছে। ক্রমশ লোকে তাহাকে 'পাগলী' আখ্যা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রামুর এক বন্ধুর বিশেষ ইচ্ছা সে শোভাকে বিবাহ করে। বহুদিন শোভা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কিন্তু তথাপি বন্ধুর বন্ধুত্ব অস্বীকার করে নাই। অভাবে অভিযোগে, অসুখে বিসুখে সর্ব্বদাই সে প্রকৃত বন্ধুর মতই ব্যবহার করিয়াছে। শাশুড়ীর বর্তমান অবস্থা, শিশুর ভবিষ্যৎ প্রভৃতি চিন্তা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত শোভা বিবাহে মত দিয়াছে। সর্ত্ত এই যে, বন্ধুকে রামুর বাড়ীতে আসিয়াই বাস করিতে হইবে। বন্ধু এক সঙ্গে মাতা, বধূ ও পুত্র লাভ করিতে সানন্দে স্বীকার করিয়াছে। বিবাহের দিনও শোভা রামুর জন্য প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছে। বন্ধু সান্ত্বনা দিয়াছে, রাগ করে নাই।

রামুর মার অবস্থা ক্রমশই যেন খারাপ হইতে লাগিল। এখন

প্রায় কাজের বাহির হইয়া গিয়াছে। শোভা ও তার স্বামী অনেক কষ্টে তাহাকে আগলাইয়া রাখে। সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। স্নানাহারের কথাও মনে থাকে না। মাঝে মাঝে নূতন রাস্তার মাঝখানে, ঠিক যেখানটায় রামু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল, সেইখানটায় বসিয়া পড়ে, "বাবা আমার" বলিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে। এই সময়ে পথে যে সব গাড়ী চলে, কোনটি একটু থামিয়া যায়, কোনটি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, কোনটি হইতে কেহ একটু 'আহা' বলিয়া সমবেদনা জানায়। কেহ বা দু' একটা পয়সা ছুঁড়িয়া দিয়া যায়। যে সব গাড়ী সর্বদা এই পথে যাতায়াত করে তাহারা এই পাগলীকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। ইহার প্রাণের গভীরতম প্রদেশের যে ব্যথা তাহাকে আজ পাগল করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া ইহাদের মনেও উদাস সহানুভূতি জাগে।

চার

সেদিন গাড়ীর খুব ভীড়। এই প্রকাণ্ড রাস্তার উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অসংখ্য গাড়ী—মোটর গাড়ী, লরী, মোটর সাইকেল, সাইকেল রিক্শ ও গরুর গাড়ী, কোথাও একটু ফাঁক নাই। নিকটেই কোথায় একটা মেলা বসিয়াছে। তাই এই বিপুল যাত্রীসমাগম। বিবিধ পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া ছুটিয়াছে বিবিধ যানবাহন।

পাগলী তাহার অভ্যাস মত রামুর শ্মশানতীর্থ সেই রাস্তার ঠিক সেইখানটায় আসিয়া আজও বসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু একা নয়। কোলে তাহার নাতি—রামুর পুত্র। কোন ফাঁকে শোভার অলক্ষিতে তাহার নয়নের মণিটি কোলে করিয়া পাগলী চলিয়া আসিয়াছে, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। রাস্তায় প্রায় সবাই পাগলীকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে।

একবার একখানি লরী একখানি রিক্‌শকে বাঁচাইতে গিয়া একেবারে আসিয়া পড়িল, পাগলীর গায়ের উপর। যথাসাধ্য ব্রেক কষিয়াও গাড়ীর গতি রোধ করা গেল না। প্রকাণ্ড চাকার নীচে পড়িয়া পাগলী ও তাহার নাতি নির্মমভাবে নিপিষ্ট হইয়া গেল।

পুত্রকে বাড়ী না দেখিয়া শোভা ছুটিতে ছুটিতে রাস্তার পাশে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা বজ্রাহত হইয়া গেল। প্রাণ দিয়া তাহার স্বামী যে পথ প্রস্তুত করিয়াছিল সেই পথের যাত্রীর উল্লাস-নৃত্যে তাহার প্রিয়তম পুত্রের সমাধি হইল, এটা ভগবানের কোন জাতীয় পরিহাস, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে শোভা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মার্চ, ১৯৪৭

অনুমতি

গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় অগাধ টাকার মালিক এবং বিপত্নীক। বড় ছেলে মানিক পিতার অবাধ্য। পর পর কয়েকটি বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ায় সে সপরিবারে পৃথক বাসা করিয়া তথায় বাস করে। পৈত্রিক সম্পত্তি ব্যতীত নিজেরও উপার্জন আছে বিবিধ ব্যবসায়ে। পৃথক হইবার পর যেন পিতা পুত্রের সৌহার্দ পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। দৈনন্দিন মনোমালিন্যের তিক্ততার পরিবর্তে এখন একটা সহানুভূতির ভাব যেন জাগিয়া উঠিতেছে। অবাধ্য পুত্র যেন প্রতিবেশী বন্ধুতে পরিণত হইয়াছে।

ছোট ছেলে অমল ঠিক বিপরীত। পিতার একান্ত অনুগত। পিতার কথার ব্যতিক্রম কখনো করে না। পিতার অনুমতি ব্যতীত কখনো কিছু করে না। এত বয়স হইয়াছে, এম. এ. পাশ করিয়াছে, তবু যেন খোকাটিই আছে। বাবাকে না বলিয়া বাড়ীর বাহিরে যায় না, বাবাকে না বলিয়া গড়ের মাঠে খেলা দেখিতে যায় না। বাবাকে না বলিয়া সিনেমায় যায় না, বাবাকে না বলিয়া কলেজ স্কোয়ারেও বেড়াইতে যায় না।

একদিন অমল পিতার কাছে আবদার করিল, সে সমস্ত ভারতবর্ষ একবার ভাল করিয়া দেখিবে। তাঁহার অনুমতি চাই এবং হাজার পঁচিশ টাকাও চাই। অবশ্য পঁচিশ হাজার টাকা গোবিন্দবাবুর কাছে একটা চিন্তার বিষয় নয়। তবে একা একা এখানে সেখানে

টো-টো করিয়া বেড়াইবে, এটা তাঁহার ভাল মনে হইতেছিল না। কিন্তু এক ছেলে অবাধ্য হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, আবার এটিও যদি রাগ করে। তাই মনে মনে প্রস্তাবটি সমর্থন না করিলেও তিনি সম্মত হইলেন।

দিন দেখিয়া সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া অমল যাত্রা করিল। পিতা বলিয়া দিলেন, ভারতবর্ষের মাটি ছেড়ে এক পাও কোথাও যেওনা কিন্তু।

অমল প্রথমেই গেল বম্বে। এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় থাকেন সেখানে। নানা প্রকার ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বম্বে সহরটা ঘুরিয়া দেখিয়া অমল মুগ্ধ হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে দার্জ্জিলিং ছাড়া অন্য কোন ভাল সহর সে এতদিন দেখে নাই। কলিকাতাও তো বড় সহর, কিন্তু বম্বে যেন কত সুন্দর। দুইদিন পরে অমল তাহার আত্মীযটির সহিত গেল মালাবার হিলে একটি বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণে। কি চমৎকার এই অঞ্চলটি!

চায়ের টেবিলে গৃহস্বামীর একটি পুত্র কথায় কথায় অমলকে বলিল, আমাদের দেশে শিল্প বাণিজ্যের কত অভাব। সামান্য সাধারণ জিনিষও কিনে আনতে হয় বিদেশ থেকে। একটু চেষ্টা করলে আমরা কত জিনিষ এদেশেই প্রস্তুত করতে পারি।

এই সূত্র ধরিয়া অমলের সহিত পান্নিকরের আলাপ আরম্ভ হইল। বহু বিষয়ে নানা প্রকার আলোচনা চলিল। অমল পান্নিকরকে চায়ের জন্য পর দিন নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। ব্যবসায়ের চিন্তাটা হঠাৎ যেন অমলকে পাইয়া বসিয়াছে। পান্নিকরের সহিত পুনরায় সাক্ষাতের পূর্ব পর্য্যন্ত সে এই চিন্তায় নিমগ্ন রহিল।

পরদিন চায়ের টেবিলে অমল বলিল, আচ্ছা পান্নিকর, এমন একটা

ব্যবসায়ের কথা চিন্তা কর তো, যা এক বছর দেড় বছরে শিখে এসে আরম্ভ করা যায়।

পান্নিকর একটু ভাবিয়া বলিল, এই ধর ছুরি, কাঁচি, এই সব। আমার মনে হয়, একবছরের মধ্যেই শেফিল্ড থেকে এটা শিখে আসা যায়।

অমল গম্ভীর ভাবে বলিল, হুঁ।

চা-পান শেষ হইল। পান্নিকর চলিয়া গেল। কিন্তু অমলের মাথার মধ্যে ছুরি, কাঁচি বিঁধিয়াই রহিল।

দুই

কয়েক দিন পরে গোবিন্দবাবু একখানি পত্র পাইলেন। পত্রখানি এডেন হইতে আসিয়াছে। পত্রে লেখা আছে—

শ্রীচরণেষু,

আমি জাহাজে বসিয়া এই পত্র লিখিতেছি। আপনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু সব কথা শুনিলে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করিবেন।

বম্বে আসিয়া এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাহার সহিত আলোচনার ফলে আমি ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি নির্ম্মাণ শিখিবার জন্য বিলাত যাওয়া স্থির করি। তদনুসারে আমি ভারত ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া বিলাতে শেফিল্ড শহরে যাওয়াই স্থির করিলাম। এম. এ. পাশ করিয়া একটা যা-তা চাকরি লইয়া সময় কাটানো আমার

মত নয়। আশা করি, আপনি আমার এই মত পরিবর্ত্তনে অসন্তুষ্ট হইবেন না।

আরব-উপসাগরটা এখন বেশ শান্ত। উপরে অসীম আকাশ, নীচে অসীম জলরাশি—উভয়ে মিলিয়া মনটাকে একটা অসীম আনন্দে ও ভাবুকতায় ভরিয়া দিয়াছে। এমন আনন্দের স্বাদ জীবনে কখনো পাই নাই।

আপনাব অনুমতি না লইয়া আমি ভারতবর্ষের মাটি পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার মনে কোনো অনুশোচনা নাই। আমি সত্যই আপনাব আজ্ঞার অবহেলা করি নাই। আপনি হয়তো মনে কবিতেছেন, আমি জাহাজে বসিয়া আপনার সহিত একটা অশোভন রসিকতা কবিতেছি। তাহা মোটেই নয়। আমি বম্বেতে জাহাজে উঠিবার সময়ে একটা বড় থলিতে ভারতবর্ষের মাটি ভরিয়া আনিয়াছি। যখনই কোন জুতা পরি, তখন জুতার সুখতলার নীচে এক পর্দা ভারতের মাটি বিছাইয়া লইয়া থাকি।

আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

প্রণতঃ—অমল

তিন

শেফিল্ড সহর। সুন্দর সহর। সুন্দর বাড়ীঘর। সুন্দর কল-কারখানা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন উপায়ে আহবিত ধনরত্ন দিয়া শেফিল্ড ও শেফিল্ডের মত আরো কত সহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

কালো লোক রাখিতে আপত্তি নাই, এরূপ একটি পরিবারের সন্ধান করিয়া অমল সেখানে আশ্রয় লইয়াছে। বাসাটি ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

পরিবারটিও ছোট। বিধবা মা, দুইটি ছেলে, দুইটি মেয়ে। ছেলে দুটি বড়। সেজ মেরী, ছোট আইভি।

অমল একটি ছোট ঘর পাইয়াছে। পাশে বাথরুম। এক খানা ঘরেই শোয়া ও বসা। শেফিল্ডের একটি বড় কারখানায় ভর্তি হইয়া অমল কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রতি সপ্তাহে বাবাকে চিঠি লেখে। খাওয়া, পরা, কাজ শেখা প্রভৃতি বিষয়ের সব খুঁটিনাটি ভরা বড় বড় চিঠি বড় বড় এন্‌ভেলপে পুরিয়া ডাকে দেয়। গোবিন্দবাবু চিঠি পাইয়া খুসীই হন।

মেরীর বয়স কুড়ি হইবে। কলেজে পড়ে।

অমল মেরীর সহিত আলাপ করে। আলোচনা করে। অমল নিজের দেশের কথা বলে, মেরীও তাহার দেশের কথা বলে। অমল দেখে, মেরীও দেখে, মানুষ মানুষই, তার বাড়ী যেখানেই হোক।

অমল ক্রমশঃ আবিষ্কার করিল, মেরীর রংটা যদি সাদা না হইত,

চোখের রঙ্ যদি নীল না হইত, চুলের রং যদি কটা না হইত, স্কার্ট ইত্যাদি না পরিয়া যদি সাড়ী পরিত, ইংরাজী না বলিয়া যদি বাংলায় কথা বলিত, চার্চে না গিয়া যদি মন্দিরে যাইত, তাহা হইলে শেফিল্ডের মেরীর সঙ্গে শেওড়াফুলির মীরার পার্থক্য থাকিত না। মেরীও তেমনই আবিষ্কার করিল, উপরোক্ত ধরণের কতকগুলি বাজে পার্থক্য না থাকিলে বাংলার অমলের সঙ্গে বারমিংহামের মিলারের কোন প্রভেদ থাকিত না। সুতরাং উভয়ের নিকট উভয়ে ক্রমশঃ আপন হইয়া উঠিতে লাগিল।

মেরীর মা খুসী হইলেন। কালো লোকগুলি মোটের উপর অসভ্য ও অবাঞ্ছনীয় হইলেও ধনী ও বিদ্বান অমলের মত জামাতা পাইবার আশায় তিনিও অমলের নেটিভত্ব ভুলিয়া অমলের প্রতি আদরের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন।

প্রায় এক বৎসর পরে একদিন মেরীর মাতা অমলকে বলিলেন, দেখ, এইবার মেরীকে তুমি বিয়ে করে ফেল।

অমল বলিল, আমার তো অমত নেই, কিন্তু বাবার মত না পেলে বিয়ে করি কেমন করে? বাবার বিনা অনুমতিতে আমি কোন কাজ করতে পারব না।

মেরীর মাতাঠাকুরাণী কিছুদিন পর পর এমনি অনুরোধ অনেকবার করিলেন। কিন্তু প্রতিবারেই একই উত্তর পাইলেন। একবার তিনি বলিলেন, তাহলে অনুমতির জন্য পত্র লেখ না কেন?

পত্র লিখে কোন লাভ হবে না। আমি বাবাকে জানি, তিনি মত দেবেন না।

অমল দুঃখিত হয়। মেরীর মাতা হতাশ হন।

চার

প্রায় দুই বৎসর হইল, অমল শেফিল্ডে আসিয়াছে। তাহার কারখানার কাজ শেখা প্রায় শেষ হইয়াছে। তাহার দেশে ফিরিবার সময় আসিয়াছে।

মেরী সম্প্রতি নার্সিংহোম হইতে ফিরিয়াছে।

ছোট্ট খোকাকে লইয়া সে সারাদিন ব্যস্ত। খোকাকে খাওয়ান, শোওয়ান, ঘুমপাড়ানো কান্না থামানো, প্রভৃতি কত কাজ। অমল মাঝে মাঝে কোলে নেয়, আদর করে। কখনো তারা দুজনেই আদর করে একসঙ্গে। তখন ছ-হাজার মাইলের দূরত্ব সঙ্কুচিত হইয়া নিমেষে সিকি ইঞ্চিরও কম হইয়া যায়।

একদিন মেরীর মাতা অমলকে ধরিয়া বসিলেন, আর অপেক্ষা করা যায় না। এবার তোমাকে বিয়ে করতেই হবে।

কিন্তু বাবার অনুমতি ?

আমি কোন কথা শুনবো না।

অমল একটু ভীত হইয়া পড়িল। আমাদের দেশে বউ যেমন শাশুড়ীকে ভয় করে, ওদেশে তেমনি জামাই ভয় করে শাশুড়ীকে। অমল আমতা আমতা করিতে লাগিল।

শাশুড়ী ঠাকরুণ বলিলেন, দেখ তুমি ছেলেমানুষ নও। তুমি ছেলেখেলা করতে আস নাই। তোমার দায়িত্ব তোমাকে বইতেই হবে, আর আমি আশীর্ব্বাদ করছি, এতে তোমরা উভয়েই সুখী হবে।

কিন্তু।

আবার কিন্তু? কোন কিন্তু নেই এর মধ্যে। আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। আগামী রবিবারে ওগিল্‌ভি চার্চে তোমাদের বিয়ে। ফাদার ক্রফোর্ডের সঙ্গে সব ঠিক করেছি। এখন কাপড় চোপড় কি কিনবে, একটা ফর্দ করে ফেল।

মানে—

চুপ। শোন, তোমার ভারতীয় পরিচিত বন্ধু যাঁরা শেফিল্ডে আছেন, তাঁদের কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করব। কয় জনকে বল্‌বে ঠিক করে জানিও। তাই বুঝে আমি ডিনারের ব্যবস্থা করব।

আমি ভাবছিলুম—

আর ভাবতে হবে না। একটা ফর্দ করে মেরীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়।

অমল নিজের ঘরে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া অনেক রকম চিন্তা করিল। মেরীর সঙ্গেও অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা বলিল। তারপর আস্তে আস্তে বাহির হইয়া পোস্ট অফিসে গিয়া পিতার নিকট টেলিগ্রাম করিল, ম্যারিয়িং মেরী নেক্স্ট্ সানডে। প্লীজ কেব্‌ল্ পারমিশন।

ডিসেম্বর, ১৯৪৭

রিক্‌শ

রাত্রি প্রায় দশটা। কনকনে শীত। স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখি, কোন গাড়ী নাই। প্রায় পাঁচ মাইল পথ যাইতে হইবে। অধীরভাবে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া দেখিতে পাইলাম, একখানি রিকশ আসিতেছে। রিকশয় দুইটি যাত্রী, সাড়ে দশটার গাড়ী ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ি রিকশ হইতে নামিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। রিকশওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাড়া যাবে ?

কোথায় যাবেন ?

মতিপাড়া।

তা যেতে পারি।

কত ভাড়া চাও ?

আজ্ঞে, দুই টাকা।

মতিপাড়ার পক্ষে দুই টাকা ভাড়া খুবই বেশি। কিন্তু এমন শীতের রাত্রে অসময়ে একটু বেশি ভাড়া চাহিবে বই কি! অনেক দরাদরি করিয়া দেড় টাকা ভাড়া স্থির হইল।

টুং টুং শব্দ করিয়া রিকশ চলিয়াছে। এই একটু আগেই রিক্‌শ-ওয়ালা অন্য যাত্রী বহিয়া আনিয়াছে। তাই এই শীতের রাত্রেও সে একটু পরেই হাঁফাইতে লাগিল। বলিলাম, রাত তো হয়েছে। একটু না হয় আস্তে আস্তেই চল।

রিক্‌শওয়ালা নীরব।

শীতে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছি। একটু অন্যমনস্ক হইবার জন্যই জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম কি ?

আজ্ঞে, মাধব।

আবার চুপচাপ। টুং টুং কবিয়া বিকশ চলিতেছে। শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছি।

একটু পরে জিজ্ঞাসা কারলাম, আচ্ছা, এত রাত্রে বিকশ নিয়ে বেরিয়েছ কেন ? আর কোন গাড়ী তো স্টেশনে নেই।

কি করব বাবু! সেই পোড়া-কপালীটার জন্যে আমার কি আর দিন রাত আছে না আহাব নিদ্রা আছে ?

কেন, কি হয়েছে ?

আজ্ঞে, কপাল বাবু, কপাল। যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে মেয়েটার বিয়ে দিলাম। দু'বছর যেতে না যেতেই—

কেন, তোমার জামাই নেই ?

আজ্ঞে, না থাকারই মত। সেটা একেবারে অমানুষ। দু'বছর যেতে না যেতেই মেয়ে আমার একেবারে বিছানা নিলে। আজ এক বছর তার চিকিৎসা করছি, কিছুতেই কিছু হয় না। পাড়ার হরি কবিরাজকে দেখালাম, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার যদু বিশ্বাসকে দেখালাম, কিছুই হল না। জামাই একবার খোঁজও নেয় না। যা কিছু ছিল আমার ওই একটি মাত্র সন্তান, ওর বিয়েতেই সব শেষ হয়ে গেছে। আর এক বছর ধরে চিকিৎসার খরচ চালাতে আমার স্ত্রীর গহনা কথানাও শেষ হতে চলেছে। মহেশ ডাক্তারকে দেখাতে তিনি বললেন, অসুখ কঠিন। কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা না করালে অসুখ সারবে না। তিনি যে ফর্দ দিলেন তাতে তো দেড়শ'

টাকার ধাক্কা। কি করব বাবু, ওই পোড়াকপালীর জন্তে দিনরাত খেটে মরছি—

মাধব রীতিমত হাঁফাইতেছে। এই কনকনে শীতেও তার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে গামছা দিয়া মুখ ও ঘাড় মুছিয়া লইতেছে। বলিলাম, একটু জিরিয়ে নাও না!

আমার হাত পা ভেঙ্গে আসছে বাবু। এখন থামলে আর এক পাও নড়তে পারব না।

আর কোন কথা বলিতে ইচ্ছা হইল না। কন্যাস্নেহ-অভিভূত মাধবের ঘন ঘন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রিকশর টুং টুং শব্দের সহিত মিলিয়া নীরব শীতের পথে একটা মর্মন্তুদ করুণ সুরের সৃষ্টি করিয়াছে।

মতিপাড়ায় পৌছিলাম। রিকশ থামিল। মাধব গামছা দিয়া মুখ মুছিতে লাগিল। পকেট হইতে একখানি দুই টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। মাধব নোটখানি সযত্নে ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিল এবং জামার এক পাশ তুলিয়া কোমর হইতে আট আনা বাহির করিয়া আমাকে ফেরত দিতে উদ্যত হইল। বলিলাম, থাক, ওটা তোমার বখশিস।

মাধব নির্বিকারচিত্তে রিকশ লইয়া প্রস্থান করিল!

আমি বাড়ীর সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইলাম।

আমার আট আনা মূল্যের সহানুভূতি দেখিয়া অন্তর্যামী একটু হাসিলেন।

মে ১৯৪৫

এক মুখে

চুঁচুড়া ময়দান। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে। ছেলেরা খেলার মাঠ ছাড়িয়া বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। কাছারীবাড়ীর দক্ষিণে যেখানটায় দুইটি রাস্তা ইংরেজি বড় হাতের টি'র মত মিশিয়াছে তাহারই পাশের বাঁধানো আলের উপর ক্রমশঃ জনসমাগম হইতেছে।

আপাতত কথা বলিতেছেন দুইটি ভদ্রলোক—অজগর সান্ন্যাল এবং পনস চক্রবর্ত্তী। সামনে দিয়া একটি মোটরগাড়ী চলিয়া যাইতেই অজগরবাবু বলিলেন, এ গাড়ীখানা কার হে?

তাও জান না? আর থাক চুঁচড়োয়।

এখানে থাকলেই বুঝি সবার গাড়ী মুখস্থ করে রাখতে হবে?

না, তা নয়। তবে ওখানা যে মহেন্দ্র চাটুয্যের গাড়ী, তা কে না জানে?

গাড়ীখানা কিন্তু বেশ।

পনসবাবু বলিলেন, তা হোক বেশ। এই দুর্দ্দিনে ওসব সখ কেন রে বাপু? যে দিন কাল পড়েছে, অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতেই মানুষের প্রাণান্ত। এখন কি ওই সব সখ সাজে?

গাড়ী থাকলে কাজেও তো লাগে।

ছাই লাগে! কি দরকার বাপু চুঁচড়ো সহরে মোটর গাড়ীর? আর তাও ওই মহেন্দ্র চাটুয্যের মত লোকের। আট আনা পয়সা

খরচ করলে সহরের একপাশ থেকে আর পাশ পর্য্যন্ত যাওয়া চলে। তেমন বিশেষ দরকার হলে ঘোড়ার গাড়ী, ট্যাক্সিও যে একেবারে না মেলে তা নয়।

অজগরবাবু বলিলেন, তা বাপু, ওর সখ আছে, গাড়ী চড়ছে, তোমার আমার কি?

পনসবাবু বলিলেন, অমন সখ থাকা উচিত নয়। মহেন্দ্র চাটুয্যেকে কে না জানে! ও লোকটা ভয়ানক খরচে, ভীষণ বেহিসেবী, টাকা খরচ করবার সময়ে ওর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না।

আরো কয়েকজন বায়ুসেবী আসিয়া পড়ায় বাক্যালাপের মোড় ফিরিয়া গেল।

পরদিন। কমিশনার মহোদয়ের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে গঙ্গার ঘাট। ভাগীরথী-শীকরবাহী মন্দ মন্দ বায়ু শরীর মন জুড়াইয়া দিতেছে। প্রাত্যহিক, সাময়িক, একবেলীয়, দুইবেলীয় প্রভৃতি নানাবিধ ভ্রমণ-কারীরা সমবেত হইতেছেন। পনসবাবু মহীরুহবাবুর সঙ্গে পায়চারী করিতেছেন। পনসবাবু বলিলেন, ভাল কথা, আপনার নাতনীটির খবর কি?

তেমন ভাল নয়। ভেবেছিলাম, কিছুদিন রাখবো এখানে আমার কাছে। ত্রিবেণীতে তার কাকার কাছে রয়েছে।

এখানে এনে রাখুন দিন কয়েক। বরঞ্চ এখানকার শাল্মলী ডাক্তারকে একবার দেখান।

ওকে তো বাসে আনা যাবে না। ট্যাক্সিও অসম্ভব ভাড়া চায়। পাড়ার মহেন্দ্র বাবুর গাড়ীখানা চেয়েছিলুম। কিন্তু তিনি অজুহাত দিলেন, ওঁর ড্রাইভার নেই।

পনসবাবু বলিলেন, তুমিও যেমন। মহেন্দ্র চাটুয্যে আবার

রাখবে ড্রাইভার। ওকে কে না চেনে এ অঞ্চলে। ওর মত কিপটে এ সহরে নেই। অসম্ভব হিসেবী, ভীষণ কৃপণ।

ইতিমধ্যে অজগর বাবু আসিয়া পড়ায় কথার মোড় ফিরিয়া গেল।

জুন, ১৯৪৬

বৈরাগ্য

কি কাণ্ড! মাত্র কুড়ি দিন হইল পল্লবেব বিবাহ হইয়াছে। ইহার মধ্যে এমন কি ঘটিতে পারে, যার জন্য পল্লবকুমার নিরুদ্দেশ হইবে!

বিবাহ, ফুলশয্যা, আট দিন পরে আসা যাওয়া, সবই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। মাত্র তিন দিন হইল নববধূ রমা শ্বশুর বাড়িতে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছে। ইহার মধ্যে কি এমন ঘটিল যাহাতে পল্লব সকালে লাল জরিপাড় ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী, হীরার বোতাম পরিয়া শ্বশুর বাড়ি যাইবে বলিয়া যাত্রা করিল, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিল না। যাইবার সময়ে শুধু মনিব্যাগে কিছু বেশী টাকা লইয়া বাহির হইয়াছিল। রমা মনে করিয়াছিল, হয়তো কিছু একটা কিনিবার জন্য বা কাহাকেও দিবার জন্যই। কিন্তু যাইবার সময়ে রমার সহিত কোন কথা হয় নাই। উভয়েই উভয়ের প্রতি ভীষণ চটিয়াছিল।

সমবয়সী, অসমবয়সী, নিকট আত্মীয়েরা রমাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বেচারা রমা চোখ মুখ লাল করিয়া কি যে জবাব দিবে খুঁজিয়া পায় না। বেশী পীড়াপাড়ি করিলে বলে, আমি জানিনে কিছু। কাজ নেই আমার অমন গোঁয়ার বরে! গৃহিণীরা শুনিয়া হাসেন, কেহ বা তিরস্কার করেন। কেহ বলেন, ওই টুকু বউ অতশত কি বোঝে? না হয় একটু অবাধ্যই হয়েছে, তাই বলে একেবারে নিরুদ্দেশ। না বাপু, লেখাপড়া শিখে কি যে সব মতিগতি হচ্ছে—

পল্লবের বাড়িতে এবং তাহার শ্বশুর বাড়ীতে তুমুল আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে। বৃদ্ধেরা বলিলেন, তোমরা ভেব না, দুদিন পরে রাগ পড়লে আপনি ফিরে আসবে। কিন্তু ইহাতে সকলে আশ্বস্ত হইতে পারেন না। কেহ রমাকে তিরস্কার করেন, কেহ বা বলেন, অলুক্ষণে বউ। মোটের উপর বিবাহের আনন্দোৎসবের পরেই এই অভাবনীয় ব্যাপারে দুইটি পরিবারেই অশান্তির বায়ু প্রবলভাবে বহিতে থাকে। সকল অনর্থের মূল রমা 'চোর' হইয়া মুখ বুজিয়া থাকে।

দুই

পল্লবকুমার নিতান্ত অন্যমনস্কভাবেই হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। অন্যমনস্কভাবেই এলাহাবাদের একখানি টিকিট করিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিল। কোথায় যাইবে? তাহা সে জানে না। আপাততঃ কলিকাতা ত্যাগ করিবে। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া কি করিবে না করিবে তাহা স্থির করিবে।

ট্রেন ছুটিয়াছে। পল্লব হাঁড়িমুখে এক পাশে বসিয়া আছে। ষ্টেশনে আসিবার পূর্বে পথে থামিয়া একটা ছোট সুটকেস এবং একখানা ধুতি, গামছা, রুমাল ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিষ তাহাতে ভরিয়া আনিয়াছিল। এই সুটকেসটিতে একটু হেলান দিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিতেছিল। একটু পরেই লক্ষ্য করিল, গাড়ীর অপর এক কোণে একটি ছোট পরিবার। স্বামী-স্ত্রী, একটি কন্যা এবং একটি পুত্র। কন্যাটির বয়স ষোল-সতের হইবে। মেয়েটি মাঝে

মাঝে পল্লবের দিকে চাহিতেছে এবং মিটমিট করিয়া হাসিতেছে। এ আবার কি! মা বাবা সামনে রয়েছেন, একটু লজ্জা নেই! তা ছাড়া পল্লবের পোষাক দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায়, সে বিবাহিত এবং সদ্য বিবাহিত। তৎসত্ত্বেও এর মানে কি! যাহা হউক, তাহার অশান্ত মনের পক্ষে এই অপরিচিতা তরুণীর সকৌতুক দৃষ্টি খুব যে ক্ষতিকর তাহা মনে হইতেছিল না।

একটা বড় ষ্টেশনে ঐ পরিবারটি অনেকগুলি খাবার কিনিলেন এবং ট্রেন ছাড়িবার পর তাহা বণ্টন করিয়া খাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পল্লব একটু অন্যমনস্কভাবে জানালার বাহিরে দূরের ক্রম-অপস্রিয়মান দৃশ্যাবলী দেখিতেছিল, এমন সময় সহসা অনুভব করিল, কে যেন তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুখ ফিরাইয়া দেখিল, সেই মেয়েটি একখানি ছোট রেকাবীতে শিঙাড়া, কচুরী, পান্তুয়া প্রভৃতি খাবার লইয়া আসিয়াছে। সে বলিল, এ খাবারগুলো মা আপনাকে দিতে বললেন, খান। একটু পরে আমি জল নিয়ে আসছি।

ব্যাপার কি! পল্লব কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল। তারপর খাবারগুলি নিঃশেষ করিয়া মেয়েটির হাত হইতে জলের গ্লাস লইয়া জল খাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে কি?

মেয়েটি বলিল, কেন, জামাইবাবুকে একটু জল খেতে দেওয়া কি দোষের?

জামাইবাবু!

হ্যাঁ, আপনি আমার পিসতুতো বোন রমাদির বর না?

হ্যাঁ, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

আমরা কমলাপুর যাব। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

আমি? কোথাও না।

মানে ?

এই, একটু বেড়াতে বেরিয়েছি।

বিয়ের পরেই বেড়াতে বেরিয়েছেন, একা যে ?

ও, এমনি।

পল্লবকুমারের বেশী কথা বলিবার ইচ্ছা নাই বুঝিয়া মেয়েটিও আর বেশী কথা না বলিয়া স্বস্থানে গিয়া বসিল।

কয়েক ষ্টেশন পরেই এই পরিবারটি নামিয়া গেলেন। নামিবার অব্যবহিত পূর্বে পল্লব উঠিয়া গিয়া ভদ্রলোক ও তাঁহার পত্নীকে প্রণাম করিল। গুরুজন তো! মেয়েটিও হাসিয়া জামাইবাবুকে নমস্কার করিল। উহারা নামিয়া গেলে পল্লবও একটু নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্থানে বসিল। মনে ভাবিল, যদি এঁরা তাহার শ্বশুর বাড়িতে চিঠি লেখেন। লিখবেনই। কোথায় যাইতেছে, তাহা তো সে বলে নাই।

তিন

দুপুর রাত্রি। হু হু শব্দে ট্রেন ছুটিয়াছে। গাড়ীতে বেশ ভীড় জমিয়াছে। যাত্রীরা সকলেই নিদ্রাকাতর। কেহ বসিয়া, কেহ একটু কাত হইয়া, কেহ একটু পা ছড়াইয়া, কেহ অপরিচিত সহযাত্রীর কাঁধে মাথা রাখিয়া, যিনি যেভাবে পারেন, একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

একটি বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। একটি পরিবার জিনিষপত্রসহ হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। স্বামী, স্ত্রী, একটি যুবতী কন্যা ও

একটি শিশু। সঙ্গে প্রায় কুড়ি একুশটা লগেজ। কেমন করিয়া লইলেন, তাহা তাঁহারা নিজেরাও বলিতে পারিবেন না। লগেজের স্তূপের অপর পার্শ্বে পল্লব কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়া একটু নিদ্রার চেষ্টায় অবহিত হইল।

প্রাতঃকালে সকলেই একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। সদ্য বিবাহিত পল্লবের বেশভূষার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই এই নূতন পরিবারের মেয়ে উষা সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া পারিল না। পল্লব মনে করিল, আবার আর একটি শ্যালিকা নয় তো ?

একটু বেলা হইতেই একটি বড় স্টেশনে এই পরিবারের ভদ্রলোক অর্থাৎ বিনয়বাবু একটি বড় কেটলিতে করিয়া প্রস্তুত চা লইয়া আসিলেন। তারপর পল্লবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, খাবেন একটু চা ? আসুন না এদিকে একটু সবে। জামাইবাবু সম্ভাষণ না পাইয়া পল্লব একটু আশ্বস্ত হইয়া ইহাদের সহিত চা পানে এবং তৎসহ কিছু আহারাদিতে যোগদান করিল। সহযাত্রীর সহানুভূতি প্রত্যাখ্যান করিয়া কি লাভ ?

বিনয়বাবু বলিলেন, কতদূর যাওয়া হচ্ছে ?

আপাততঃ এলাহাবাদ পর্যন্ত।

তারপর ?

এখনও ঠিক করিনি। তবে হরিদ্বারের দিকে যাব মনে করেছি।

উষা ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছে। উষার মাতাঠাকুরাণী তাহাকে নিবৃত্ত করিতেছেন। বিনয়বাবু বলিলেন, এলাহাবাদে কোথায় উঠবেন ?

তাও ঠিক করিনি। কোন একটা হোটেলে উঠব মনে করেছি।

দেখুন, আপনি বাঙালী। আমরা এতগুলি বাঙালী থাকতে আপনি

দুদিনের জন্যে হোটেলে উঠবেন, সে হয় না। আপনি চলুন, আমাদের বাড়িতেই থাকবেন। আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

পল্লব আপত্তি করিল না। দুই তিনদিন পরেই তো হরিদ্বার বা দ্বারকা চলিয়া যাইবে। সংসারই যখন ত্যাগ করিতেছে, তখন আর এই পরিবারটিকে ভয় করিবার কি কারণ আছে?

চার

পল্লব খায়-দায় ঘুমায় এবং বাকি সময়টা মুখ গোমড়া করিয়া বসিয়া থাকে। বৈরাগ্যে যাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার মুখে হাসি আসিবে কোথা হইতে?

বিনয়বাবু তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপারটা কি বোঝা যাচ্ছে না।

স্ত্রী বলিলেন, উষা বলছিল, উনি নিশ্চয় বাসরঘর থেকে পালিয়েছেন। কি জানি বাপু।

বিনয়বাবু পল্লবকুমারকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কলিকাতায় কোথায় থাকেন, কোথা হইতে আসিতেছেন। তার উত্তরে পল্লব উদাসভাবে বলিয়াছে, যা পেছনে ফেলে এসেছি, তা পিছনেই থাক।

বিনয়বাবু আর কি বলিবেন? অগত্যা চুপ করিয়াই থাকেন।

একদিন সকালে পল্লব বলিল, আমি হরিদ্বারে যাওয়া স্থির করেছি।

বিনয়বাবু বলিলেন, কবে?

আজ। দুপুরে যাব টিকিট করতে।

কিছুক্ষণ পরে একজন হকার একখানি সংবাদপত্র বারান্দায় ফেলিয়া গেল। উষা সেখানি তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। এক পৃষ্ঠায় একখানি ছবি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। একটি নিরুদ্দিষ্ট যুবকের ছবি এবং তাহার বর্ণনা। অবিকল পল্লব। সে কাগজের ঐ পাতাটি লইয়া পিতাকে দেখাইল। পাতাটি পৃথক করিয়া সরাইয়া রাখা হইল।

বিনয়বাবু অতি বিনীত সুরে পল্লবকে বলিলেন, দেখুন, আমার একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে।

কি অনুরোধ ?

বলুন, আমার অনুরোধ রাখবেন ?

সম্ভব হ'লে নিশ্চয় রাখব। আপনারা আমাকে এত যত্ন করলেন।

দেখুন, পাঁজিতে দেখলুম আজ আর কাল দিন দুটো খুব খারাপ। আপনি পরশুর আগে এখান থেকে যেতে পারবেন না।

পল্লব একটু চিন্তা করিল এবং পরে বলিল, তা আপনারা যখন বলছেন, আর দুটো দিন থেকেই যাই।

'পরশু' আসিল। প্রাতে আহারাদির পর পল্লব ষ্টেশনে গিয়া হরিদ্বারের টিকিট কিনিয়া আনিয়া জিনিষপত্র অর্থাৎ সুটকেসটি গুছাইয়া রাখিয়া একটু বিশ্রাম করিতে গেল। বৈকালে ট্রেন।

পল্লবের মনে হইল একখানি টাঙা আসিয়া এই বাড়ীতে থামিল। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল একটি যুবক এবং একটি অবগুণ্ঠনবতী তরুণী টাঙা হইতে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে পল্লবের একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। সে শুনিতে

পাইল, বাড়ির মধ্যে কি সব যেন আলোচনা হইতেছে। কথার শব্দ কানে যাইতেছে, কিন্তু অর্থ বোঝা যাইতেছে না।

যুবকটি বলিতেছে, আপনাদের টেলিগ্রাম পেয়েই আমি আমার বোনটিকে নিয়ে চলে এসেছি। এখন, ব্যবস্থা যা হয়, আপনারা করুন। আমার ভয় হচ্ছে, আবার একটা অনর্থ না হয়। কিছুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ হইল। তারপর সব নীরব।

পল্লবকুমার এই গাড়ী আসা এবং তারপর নানাপ্রকার গুঞ্জন একটু সন্দেহের সঙ্গেই দেখিতেছিল এবং শুনিতেছিল। তথাপি তাহার মনে এমন কোন সন্দেহ আসে নাই যে, তাহারই বধূ শ্যালক এখনই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তবু পল্লবকুমার মনে করিল, এখানে আর বিশ্রাম করিয়া কাজ নাই। বরং ষ্টেশনেই একটু বসিয়া থাকা যাইবে।

ইহাই স্থির করিয়া পল্লব বিছানায় উঠিয়া বসিল এবং যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। যাইবার সময়ে বিনয়বাবুকে ডাকিয়া বলিয়া যাইবে, না তাঁহার অজ্ঞাতসারেই চলিয়া যাইবে এই কথা চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে দরজাটা আস্তে খুলিয়া আবার বন্ধ হইয়া গেল এবং গৃহে প্রবেশ করিল রমা।

রমা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পল্লবের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আজ হরিদ্বার যাচ্ছ?

পরম বিস্মিত পল্লব সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

রমা ধীরে ধীরে বিছানার উপর পল্লবের পাশে গিয়া বসিল।

সেইদিনই বৈকালে রমা এবং পল্লব উভয়ে ষ্টেশনে গিয়া হরিদ্বারের একখানি টিকিট ফেরত দিয়া তিনখানি কলিকাতার টিকিট কিনিয়া আনিল।

দোসরা এপ্রিল

দোসরা এপ্রিল। পয়লা নয়। প্রাতে রান্নাঘরে ঢুকিয়াই গৃহিণী বিস্মিত হইয়া গেলেন। উনানের পাশে বসিয়া ঠাকুর অর্থাৎ পাচক ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

গৃহিণী যেন কি একটা হুকুম করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ ক্রন্দনরত ঠাকুরকে দেখিয়া একেবারে অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। ক্রমশঃ তাঁহার মনে ঔৎসুক্য, অনুসন্ধিৎসা, অনুকম্পা এবং সমবেদনা উদ্রিক্ত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন, তুমি কাঁদছ কেন?

প্রশ্ন শুনিবামাত্র ঠাকুরেব মনোবেগ আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে আরও প্রবলবেগে ফুঁপাইতে লাগিল এবং দুই-একবার বাঁ হাতের আঙুল দিয়া নাসিকাশ্রু মোচন করিয়া ফেনের গামলার মধ্যে ফেলিয়া দিল।

গৃহিণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এত কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার?

কোন উত্তর নাই। শুধু প্রবলবেগে ফোঁস ফোঁস করিয়া কান্না।

গৃহিণী পুরাতন ঠাকুরের এতাদৃশ ব্যবহারে অতিমাত্রায় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন, একটা বড় রকমের বিপদ হইয়াছে। সেটা যে কি এবং কত ভয়ানক, তাহা অনুমান করিতে চেষ্টা করিয়া এবং অনুমান করিতে না পারিয়া তাঁহার ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল। ওদিকে কান্নাও ক্রমশঃ গভীর ও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে।

এতে

গৃহিণীর মনে পড়িয়া গেল বহুদিন পূর্বের কথা, যখন এই ঠাকুরটি প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল এই বাড়িতে। দেখিতে মানুষের মত, অথচ ঠিক যেন মানুষ নয়। ভাত সিদ্ধ হইয়াছে কি না বুঝিতে পারিত না। সম্বরার নাম শুনিয়া এত বড় একটা হাঁ করিয়াছিল যে, তাহার মধ্যে স্বচ্ছন্দে চারটি ফোড়ন ও দুটি তেজপাতা ফেলিয়া দেওয়া যাইত। ঠাকুর হাতা বা খুন্তির হাতল ধরিয়া থাকিত আর গৃহিণী সেই হাতাখুন্তি সমেত ঠাকুরের হাতখানি ধরিয়া ধরিয়া মাছ ভাজিতে শিখাইয়াছিলেন। প্রায় ছয় মাস অভ্যাসের পর অম্বলের সরিষা সম্বরা কতকটা ঠিক হইয়াছে। পোড়া ডাল, আলুনি মাছের ঝোল, অসিদ্ধ তরকারী, নুনে পোড়া ডালনা প্রভৃতি খাইতে খাইতে ঠাকুরের প্রতি এবাড়ীর প্রীতি ক্রমশঃ জমিয়া উঠিয়াছে। এখন সে শুক্ত রাঁধিতে পারে, ধোঁকার ডালনা রাঁধিতে পারে, চিংড়িমাছের মালাই-কারীও রাঁধিতে শিখিয়াছে। সেদিন তো নিমকি ভাজিয়াছে, ডিমের ওমলেট পর্য্যন্ত করিয়া দিয়াছে।

এমন গুণের ঠাকুর কাঁদিতেছে, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। কাহার সহ্য হয়? ক্রমশঃ গৃহিণীও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অতি নম্র সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে, বল না?

ঠাকুর কোন কথা বলিল না। কোমরের খুঁট হইতে একখানি ভাঁজ করা পাতলা কাগজ আস্তে হাত বাড়াইয়া গৃহিণীর দিকে ফেলিয়া দিয়াই আবার কান্নার মাত্রা বাড়াইয়া দিল।

গৃহিণী কাগজখানি লইয়া আমার কাছে আসিলেন। কাগজ খুলিয়া দেখা গেল, একখানি টেলিগ্রাম—ভ্রাতা কলেরায় মৃত—এখনি এস।

গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, আহা বেচারা।

তাইতো! এখনি আবার বাড়ী যেতে চাইবে না তো!

তা, চাইবেই তো।

মুস্কিল আর কি। আবার একটা কোথা থেকে জুটবে কে জানে!

গৃহিণী ঠাকুরের কাছে পুনরায় যাইতেই সে আবার কাঁদিয়া উঠিল, মোর কপাড় ভাঙ্গিল।

কি করবে বাছা। জীবন-মৃত্যুর পরে তো মানুষের হাত নেই।

মোর আর কেউ নেই—

তা অমন সবারই কি চারটে পাঁচটা ভাই থাকে?

ঠাকুর ধুতির খুঁটে চোখ মুছিয়া বলিল, আমাকে তিন দিনের ছুটি দিতে হবে। একবার গিয়ে দেখে আসব বাড়ির লোকদের। ছেলের শোকে আবার মা'র না কিছু ভালমন্দ হয়ে বসে।

তা বেশ, যাও; একবার দেশে ঘুরে এসো। হ্যাঁ, অত ব্যস্ত হয়ো না।

গৃহিণী আমাকে সংবাদ দিলেন, ঠাকুর বাড়ি যাইতেছে তিন দিনর জন্য।

বলিলাম, আচ্ছা। তা মাইনেটা দিয়ে দাও।

মাইনে কাল বিকেলেই তো দিয়ে দিয়েছি।

বেশ করেছ।

ঠাকুর তিন দিনের ছুটীতে বাড়ি গিয়াছে। গৃহিণী রান্নাঘরে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। যথারীতি রান্নার পর খাওয়া এবং খাওয়ার পর রান্না করিবার সুযোগ পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। তিনটা দিন বই তো নয়। সেলাই আর নভেল আর কাঁহাতক ভাল লাগে।

তিনদিন গেল, সাতদিন গেল, এক মাস গেল—ঠাকুর ফিরিল না। রন্ধনতার্থ গৃহিণীর এবং তৎসহ আমারও অসহ হইয়া উঠিয়াছে। রন্ধন ও আহার ব্যতীত জীবনে যে আরও কাজ থাকতে পারে, তাহা ক্রমশঃ অতিমাত্রায় বোধগম্য হইতেছে। ঠাকুর-খোঁজা সুরু হইয়াছে। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী বহু ব্যক্তিকে বলা হইয়াছে। তিন দিনের জন্য বাড়ি গিয়া কেন ফিরিয়া আসিল না, তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুমান করা হইতেছে। হয়তো, তাহারও অসুখ করিয়াছে, কিংবা একটি পুত্র গত হওয়ায় বৃদ্ধা মাতা অন্য পুত্রটিকে আর বিদেশে পাঠাইতে চাহিতেছে না, ইত্যাদি নানাপ্রকার অনুমান করা হইতেছে এবং তাহার প্রত্যাগমন সম্বন্ধে সকলেই হতাশ হইতেছে।

একদিন অফিস হইতে ফিরিবার সময়ে বোস কোম্পানীতে একটা ঔষধ কিনিবার জন্য ট্রামের দুইটি ষ্টপ পূর্বেই নামিয়া পড়িয়াছি। ঔষধটি লইয়া পাশের গলির ভিতর দিয়া একটি সোজা রাস্তায় বাসায় ফিরিতেছি, এমন সময়ে দেখি, একটি রোয়াকের উপরে পাটি পাতিয়া একটি তাসের আড্ডা বসিয়াছে। সামনেই আমার দিকে পিছন করিয়া বসিয়া আছে আমাদের পুরাতন ঠাকুর! মনে হইল, টোয়েন্টি-নাইন খেলা হইতেছে। আমাদের পুরাতন ঠাকুরের পাশে একখানি লাল রংএর তাস—তাহাতে পাঁচটি লাল বাহির হইয়া আছে।

ঠাকুরকে দেখা না দিয়াই বাসায় ফিরিলাম এবং গৃহিণীকে বলিলাম তাঁহার হাত-ধরিয়া শেখানো ঠাকুরের তাস-খেলার গল্প।

গৃহিণী আস্তে আস্তে বলিলেন, আমি সে খবর তোমার অনেক আগেই পেয়েছি, বিন্দী ঝির কাছে। কাল সকাল থেকে সে কাজে আসবে বলেছে। বাসন-কোশন মেজে রাখতে বলেছে।

আসবেই যদি, তবে চলে গেল কেন ?

যে জন্য চলে গিয়েছিল, সেই জন্যই আবার ফিরে আসবে। সে বাড়িতেও আজ তার টেলিগ্রাম এসেছে।

গৃহিণী গেলেন চায়ের জোগাড় করিতে, আর আমি গেলাম কাপড় ছাড়িতে।

এপ্রিল, ১৯৪৭

কুমড়ো

বাগবাজারের নন্দ মুখার্জির গলিতে তের নম্বর ছোট বাড়িখানির সামনে দাঁড়াইলে দেখা যাইবে, প্রায় পাশাপাশি দুইটি দরজা। একটির উপরে লেখা ১৩এ, আর একটির উপরে লেখা ১৩বি। দরজার ভিতরে গেলে দেখা যাইবে, দুইখানি ছোট একতলা বাড়ি প্রায় একই ধরণের। দুইখানি করিয়া শোবার ঘর, তাছাড়া ভিতরের দিকে একফালি বারান্দা, একখানি রান্নাঘর, একটু ভাঁড়ার ঘর, একটু কলতলা, ইত্যাদি। দুই বাড়িরই একটি করিয়া খিড়কি দরজা। বাড়ির পিছনে একটু খোলা যায়গা অব্যবহৃত থাকায় যথারীতি ভাঙ্গা কাঁচ, খোলার কুচি, ইটপাটকেল প্রভৃতিতে ভরা। এই খোলা যায়গাটি বাড়ি দুইটির জন্য দুই ভাগ করা। মাঝে কতকগুলি আগাছার সারি। সীমানা সুনির্দিষ্ট না হইলেও মোটামুটি দুইটি ভাগ বেশ বোঝা যায়।

১৩এ-তে থাকেন বিনোদ বাবু, তাঁর স্ত্রী আর দুটি ছেলে মেয়ে। বিনোদ বাবু কাজ করেন কর্পোরেশনে। বেতন ও উপরি দিয়া কায়ক্লেশে সংসার চালান। ১৩বি-তে থাকেন বিপিন বাবু, তাঁর স্ত্রী আর একটি মেয়ে। বিপিন বাবু কাজ করেন বামার লরিতে। বেতন ও উপরি দিয়া কায়ক্লেশে সংসার চালান। বিপিন বাবু ও বিনোদ বাবু বহুদিন হইতে এই দুই বাড়িতে আছেন। তাঁহাদের পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধটা ক্রমশঃ বেশ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। প্রায়

এক সঙ্গেই অফিস যান, প্রায় এক সঙ্গেই ফেরেন। পরস্পরের খোঁজ খবর নেন। বিনোদবাবু অসুস্থ হইলে, বিপিন বাবু তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বিপিনবাবুর স্ত্রী অসুখে পড়িলে বিনোদ বাবুর স্ত্রী বিপিনবাবুকে আর তার মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান। আবার বিনোদ বাবুর স্ত্রীর কানে নূতন দুল দেখিলে, বিপিন বাবুর স্ত্রীর মুখখানা ভার হইয়া উঠে, বিপিনবাবুর পায়ে নূতন জুতা দেখিলে বিনোদ বাবুর মনটা খচ্‌খচ্‌ করিয়া উঠে। প্রতিবেশীর দুঃখে দুঃখী হওয়া যত সহজ, সুখে সুখী হওয়া ততটা সহজ নয়। দুঃখের দিনে বিনোদ-বিপিন যেমন পরমাত্মীয়, সুখের দিনে তাঁহাদের মনের অবস্থাটা ঠিক তেমন থাকে না।

একদিন বিপিনের মেয়ে পিছনের খিড়কির দরজা খুলিয়া দেখে একটি কুমড়াগাছ গজাইয়াছে, খোলা জায়গাটার মাঝখানে। কিছুদিন পরে যখন গাছটি বড় হইয়া উঠিল তখন বিপিন-গিন্নি গিয়া কষ্টেসৃষ্টে একটি মাচার মত করিয়া দিয়া আসিলেন। গাছ বড় হইতে লাগিল, ক্রমশঃ ফুলও হইল, কিন্তু কুমড়া আর হয় না। আরো কিছুদিন পরে সত্যই একটি কুমড়ার গুটি বড় হইতে আরম্ভ করিল। যখন বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে এবং পাকিবার রং ধরিয়াছে, তখন একদিন হঠাৎ বিনোদের স্ত্রী তাঁহাদের খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া সেটা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, গাছটির গোড়া তাঁহারই জমিতে। তিনি তৎক্ষণাৎ বিপিন বাবুর বাড়িতে গিয়া বলিলেন, আমাদের কুমড়াগাছে যে কুমড়াটা হয়েছে, সেটা যেন তোমরা তুলে নিও না।

বিপিন-গিন্নী বলিলেন, তোমাদের কুমড়োগাছ! ওটা তো

আমাদের জায়গায় হয়েছে, আমি মাচা বেঁধে দিয়েছি। আমার মেয়ে এত দিন ধরে যত্ন করেছে। গাছটা তো আমাদের।

আমাদের বললেই হলো! ওর গোড়া যে আমাদের জমিতে। মাঝের সীমানা দেখেছো, তার প্রায় দু' আঙুল এদিকে ওর গোড়া।

কলহটা গৃহিণী হইতে আরম্ভ করিয়া কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। পরদিন প্রাতে বাড়ির সামনে নন্দ মুখার্জির গলিতে বিপিন-বিনোদের বচসা ক্রমশঃ ভদ্রতার সীমা ছাড়াইয়া গেল। পাড়ার লোক জড় হইল। কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন, বাপু, কুমড়োটা কেটে দু'ভাগ করে নাও। ল্যাঠা চুকে যাক্।

বিপিন গর্জিয়া উঠিল, কক্ষণো না। ওগাছের একটা পাতাও ওকে দেবো না।

বিনোদ লাফাইয়া উঠিল, আলবৎ দিতে হবে। সমস্ত গাছটাই আমার। যত গুলো কুমড়োর ফুল ভাজা খেয়েছো, তার দাম দিতে হবে।

কলহটা ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে উঠিতে লাগিল এবং ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বিপিন একবার বিনোদকে একটা ধাক্কা দিয়া বসিল। বিনোদ পড়িবার সময়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া যাইতেই একটু রক্ত বাহিয়া পড়িল মাথার পাশ দিয়া। বিনোদের স্ত্রী, কি হ'লো গো, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

থালপার থানায় খবর গেল। দারোগা মহেশবাবু আসিয়া বিনোদ ও বিপিনকে থানায় লইয়া গেলেন। সঙ্গের কনেষ্টবলটি বাড়ির ভিতরে গিয়া একখানি ছুরি দিয়া ক্যাঁচ করিয়া কুমড়োটির বোঁটা কাটিয়া কুমড়োটিকে কাঁধে করিয়া উহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। থানায় পৌছিয়া জবানবন্দী লইয়া বিনোদ ও বিপিনকে আপাতত ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

কুমড়োটি ১নং একজিবিট হিসাবে মহেশবাবুর বৈঠকখানার তাকে শোভা পাইতে লাগিল।

থানার সঙ্গেই দারোগাবাবুর কোয়াটার্স।

দারোগাবাবু বাড়ির ভিতরে গিয়া স্নানাদি সারিয়া আহারে বসিলেন। গৃহিণী পাশে বসিয়া একখানি পাখা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, মনে আছে তো?

কি, বলতো?

আমার কোন কথাটাই বা তোমার মনে থাকলো?

আহা, চটো কেন? বলই না, কোন কথাটা।

আমি একবার যাবো শ্যামবাজারে। দিদির ছেলে মণ্টুর আজ জন্মদিন।

বেশ তো, যাও, ঘুরে এসো।

মহেশবাবু আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন। গৃহিণী আহারাদি সারিয়া, সাজিয়া গুজিয়া, খুকীকে সাজাইয়া, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলেন, আমি এখন যাচ্ছি। পার তো সন্ধ্যার দিকে একবার ঘুরে এসো না।

আমার বোধ হয় যাওয়া হবে না। সন্ধ্যার পর একটা দরকারী তদন্তে যেতে হবে।

আচ্ছা, আমি চল্লুম। কি করে যাই বল তো?

আফিস ঘরে রাম সিং আছে। ওকে বল, একখানা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে দেবে। ওকেই সঙ্গে নিয়ে যাও, পৌছে দিয়ে আসবে।

দারোগা গৃহিণী অফিস ঘরে আসিয়া রাম সিংকে গাড়ী ডাকিতে পাঠাইয়া দিলেন। ঘরের একটি তাকের দিকে লক্ষ্য করিতেই কুমড়োটিকে দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলেন। গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই,

কলসী কাঁখে করিয়া যেমন করিয়া মেয়েরা পুকুরের ঘাট হইতে সিঁড়ি বাহিয়া ওঠে, ঠিক সেই ষ্টাইলে কুমড়োটিকে কাঁখে করিয়া খুকীর হাত ধরিয়া তিনি গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

শ্যামবাজারে দিদির বাড়িতে পৌঁছিতেই দিদি বলিলেন, এসেছিস বেশ করেছিস। এখন একটা বুদ্ধি দে তো। বিকেলে উনি কয়েকজন বন্ধুকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন, মণ্টুর জন্মদিন উপলক্ষে। মিষ্টি ফিষ্টি কিছু আনিয়েছি। সঙ্গে বাড়ির কিছু হ'লে ভাল হ'তো। আটা ঘরে আছে, কিন্তু তরী তরকারী তো কিছু নেই। পারিনে এখন আবার বাজার থেকে তরকারী ফরকারী আনতে। দিনকাল যা পড়েছে, বুঝতেই তো পারছিস।

কিছু তোমায় ভাবতে হবে না। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। আমি যে কুমড়োটা এনেছি, ওতেই সব হ'য়ে যাবে। আজকার কাজ হয়ে আরো কিছু বরং বেঁচেই যাবে। দালদায় ভাজা কন্‌ট্রোলের আটার লুচির সঙ্গে কুমড়োই মানাবে ভাল।

বৈকালে নিমন্ত্রিতেরা আসিলেন। বেশী কেউ নয়—দিদির স্বামীর বিশেষ পরিচিত কয়েকজন মাত্র। বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই সকলে আহার করিলেন। লুচি, কুমড়ো ভাজা, কুমড়োর ছেঁচকি, কুমড়োর ছোঁকা, কুমড়ো আর আলুর একটা তরকারী, আর কুমড়োর চাটনি। তারপর দুই তিন প্রকার মিষ্টান্ন ও দই। পরে চা।

বিদায়ের সময়ে গৃহ-কর্তা সবিনয়ে একে একে বন্ধুবর্গকে বিদায় দিতে লাগিলেন। বিপিন ও বিনোদের হাত ধরিয়া বলিলেন, একটু কষ্ট দিলুম ভাই, কিছু মনে করো না।

হাঁ, এমনি কষ্ট মাঝে মাঝে দিও। তোমার মণ্টুর এমনি জন্মদিন চির দিন হোক। বাছা সুখে থাক।

তোমাদের আশীর্ব্বাদ ও মাথায় ক'রে রাখবে।

খুব আশীর্ব্বাদ করবো। আজ আগাগোড়া যা মিষ্টি খাইয়েছ। আচ্ছা, অমন চমৎকার কুমড়ো কোথায় পেলে বলতো? যেমন মিষ্টি, তেমনি নরম। আর রান্নাও চমৎকার হয়েছে।

ওসব রেঁধেছেন আমার ছোট শালী। তিনিই তো দুপুরে একটা মস্ত কুমড়ো নিয়ে এসে হাজির। ওঁর স্বামী সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন, খালপার থানার দারোগা হয়ে। আর একদিন এসো, ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। খাসা লোক। আজ তিনি আসতে পারেন নি।

কথাগুলি শুনিয়া বিপিন ও বিনোদের মুখের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহা দেখা গেল না।

দারোগা-গিন্নি বাড়ি ফিরিতেই মহেশবাবু বলিলেন, অফিস ঘর থেকে কুমড়োটা কে নিলে?

আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। দিদিকে দিলুম। তরকারী রেঁধে সবাই খেয়ে খুব খুসী।

তা তো খুসী। কিন্তু ওটা যে একটা কেসের ১নং একজিবিট।

আমি কি তা জানি? বেশ তো, একটা কুমড়ো বাজার থেকে আনিয়ে নিও।

বলা বাহুল্য, দারোগা বাবুকে আর কুমড়ো কিনিতে হয় নাই।

জুন, ১৯৪৫

নাটক

সুজিত এবং অরুণা অনেক দিন হইতেই পরস্পরের সহিত পরিচিত। কত শারদোৎসবে, বসন্তোৎসবে, রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে তাহারা গান করিয়াছে, আবৃত্তি করিয়াছে, অভিনয় করিয়াছে, কতদিন উৎসবের পব কত বিষয় লইয়া আলোচনা কবিয়াছে, এক সঙ্গে বসিয়া কফি খাইয়াছে। কতদিন সুজিত অরুণাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়াছে, কখনও পদব্রজে কখনও বা গাড়ীতে। হয় তো কখন কখন কাহারও মনের কোণে এই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার একটা স্থায়ী রূপ জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কেহ কাহাকেও কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলে নাই। মাঝে মাঝে দেখা শুনা, আবৃত্তি অভিনয়, উচ্ছল হাসি গল্প, প্রভৃতির অন্তরালে কোন গভীরতর উন্মাদনাব কোন আভাস প্রকটিত হয় নাই।

একটি জরুরী কাজের ভার লইয়া সুজিতকে সহসা কলিকাতার বাহিরে যাইতে হয় এবং নানাস্থানে কিছুকাল ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। প্রথমে দুই একবার কাজের ফাঁকে সুজিত কলিকাতায় আসিয়াছে এবং তখন অরুণার সঙ্গে সাক্ষাৎও হইয়াছে। কিন্তু পরে আর সুজিতের কলিকাতায় আসা হয় নাই এবং অরুণার সঙ্গে সাক্ষাৎও হয় নাই। প্রায় দুই বৎসরের উপর কেহই কাহারও দেখা সাক্ষাৎ পায় নাই।

বাহিরের কাজ শেষ হইয়া গেলে সুজিত কলিকাতায় ফিরিয়াছে।

অরুণার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত প্রধানত উৎসবে এবং বৈঠকে। তাহার বাড়ীর সহিত সুজিতের বিশেষ পবিচয় ছিল না। বাড়ীর দ্বার পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে সে কযেকবার অরুণার বাড়ীতে গিয়াছে, কিন্তু বাডীর অপর কাহারও সহিত আলাপ পরিচয়ের কোন উপলক্ষ ঘটে নাই।

কলিকাতায থাকিতে মাঝে মাঝে অরুণাব সহিত সাক্ষাৎ হইযাছে, একত্র আনন্দ করিযাছে, কিন্তু তাহাব প্রতি কোন গভীব আকর্ষণ অনুভব করে নাই। বিগত দুই বৎসর কলিকাতাব বাহিরে থাকিয়া তাহার মনের মধ্যে অরুণাব প্রতি একটা আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠিযাছে এবং মনে কবিয়াছে, এবাব সাক্ষাৎ হইলেই যত শীঘ্র সম্ভব একটা বুঝা পড়া কবিযা লইব। কলিকাতায় আসিয়া অরুণাব বাড়ীতে গিয়া তাহারা দেখে তাহাবা সে বাডী ছাডিযা চলিযা গিয়াছে। তাহাদেব নূতন ঠিকানা সেখানে পাইল না। মনে আশা রহিল, আবার কোন উৎসবে হয তো এমনিই দেখা হইয়া যাইবে। তাহার নূতন আবাসের ঠিকানা সংগ্রহ কবিবার জন্য সে অন্যরূপেও চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সে অল ইণ্ডিযা রেডিওর একটি নাটকাভিনয় উপলক্ষে আমন্ত্রণ পাইয়া অভিনযেব জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সবিস্ময়ে এবং সানন্দে সে সংবাদ পাইল, সে-ই নাটিকাটির নায়ক এবং অরুণাই তাহার নায়িকা। বলা বাহুল্য এই অপ্রত্যাশিত যোগাযোগে তাহার মন অতিশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর নাটক অভিনয আরম্ভ হইয়াছে। এই অভিনযেব একটি বড় সুবিধা এই যে কোন মেক্-আপের বা সাজ-সজ্জার প্রয়োজন হয় না, পাঠ মুখস্থ করিতে হয় না এবং অঙ্গভঙ্গীও

করিতে হয় না। শুধু গলার স্বরটা এবং কথার ভঙ্গী ও গানের সুর ঠিক হইলেই হইল। নাটকটির একস্থানে আছে—নায়িকা বহু দিন পরে নায়কের সাক্ষাৎ পাইয়া আনন্দিত হইয়া অভিমানরুদ্ধকণ্ঠে নায়ককে অভ্যর্থনা করিতেছেন। এই স্থানে অরুণা ও সুজিতের মধ্যে কথা হইতেছে—

অ। প্রিয়তম, তুমি কি নিষ্ঠুর!

সু। কেন প্রিয়ে, কিসে আমার নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেলে?

অ। এই দীর্ঘ দুই বৎসর। একটিবার আমার কথা মনে করেছিলে?

সু। প্রত্যহই তো মনে করতাম।

অ। ছাই করতে—

এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে নায়িকার চোখে জল আসিল এবং নাক ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল। অবশ্য অরুণাকে কিছুই করিতে হইল না। পাশে বসিয়া একজন একটি মোটর গাড়ীর বাল্‌ব-হর্ণের বাল্‌বটিতে একটু জল পুরিয়া ঘন ঘন টিপিতে লাগিল। তাহাতেই অভিমানিনী নায়িকার নাকের ও চোখের ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ভাব প্রকটিত হইল।

সু। নিশ্চয়ই করতাম। আমাকে বিশ্বাস কর। নবারুণ-উদ্ভাসিত স্নিগ্ধ প্রভাতে, দারুণ গ্রীষ্ম-সম্বলিত রুক্ষ মধ্যাহ্নে, মৃদু-সমীর-আন্দোলিত সুন্দর অপরাহ্ণে, নিস্তব্ধতা-পরিশোভিত গভীর রজনীতে শুধু তোমাকেই তো স্মরণ করেছি, তোমার ওই কমনীয় মুখখানি—

অ। থাক, থাক, আর অত আধিক্যেতা দেখাতে হবে না।

এই বলিয়া নায়িকার নায়কের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফোঁস ফোঁস করিবার কথা। কিন্তু রেডিওতে বুকের মধ্যে মুখ লুকাইবার

প্রয়োজন নাই। উপরোক্ত প্রকারে ফোঁস ফোঁস শব্দ হইলেই যথেষ্ট।

ক্রমশ অভিনয় শেষ হইল। সুজিত অরুণার কাছে গিয়া বলিল, কতদিন পরে দেখা—

হ্যাঁ।

আর এমনি একটা অভিনয় উপলক্ষে।

হ্যাঁ।

ফার্ষ্ট এম্পায়ারের সেই নৃত্যোৎসবের পরে এই আমাদের প্রথম একসঙ্গে উৎসব।

হ্যাঁ।

নাটকটা খুব ছোট হলেও বেশ জমেছিল, না?

হ্যাঁ।

এই ধরণের কথা বলিতে বলিতে তাহারা বাহিরের অফিসঘরে গিয়া রসিদ সহি করিয়া চেক লইয়া বাহিরের দিকে আসিতেই সুজিত বলিল, চলুন আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি। আপনার এখনকার ঠিকানাটা তো জানি নে।

অরুণা ঠিকানা বলিল এবং আরও বলিল, আমাদের একখানা নূতন গাড়ী কেনা হয়েছে। ঐ যে, ওইখানা। চলুন, আমিই আপনাকে পৌছে দি।

সে তো আমার সৌভাগ্য!

গাড়ী চলিয়াছে। ড্রাইভারকে সুজিতের ঠিকানা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই একেবারে চুপ করিয়া রহিল। তাহার বাড়ীর নিকটে যখন আসিয়া পড়িয়াছে, তখন সুজিত বলিল,

এই দুই বৎসর আমার কাছে মনে হয়েছে দুই যুগ। আপনাকে আর কতদিন আপনি বলব? এবার কিন্তু আর শুধু শুধু অভিনয় নয়।

কি যে বলেন! বসুন চুপ করে।

কি আশ্চর্য্য! এতদিন পরে দেখা, আমাকে বলবার মত একটা কথাও কি তোমার নেই?—এই ড্রাইভার, এই সামনে বাঁ-দিকে দাঁড়াও। গাড়ী থামিল।

সুজিত গাড়ীর দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল।

অরুণা বলিল, এত কাছে আপনি থাকেন, তা তো জানতুম না। তা হলে নিশ্চয়ই চিঠি দিতুম। পরশু আমার বিয়ে। নিশ্চয়ই যাবেন কিন্তু। নইলে খুব রাগ করবো।

পরশু?

হ্যাঁ, পরশু—

পরশু—যাব, নিশ্চয়ই যাবো।

অরুণার গাড়ী ষ্টার্ট দিল।

এপ্রিল ১৯৫১

বাজে লোক

হরিহর বাবু একটু মুস্কিলে পড়িয়াছেন। তাঁহার একটি নিকট-আত্মীয়া একটি বিষয়-সংক্রান্ত মামলায় জড়াইয়া-পড়িয়াছেন এবং এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, দুই-এক দিনের মধ্যেই নগদ নয় হাজার টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিছু দিন পরে অবশ্য ইহার দ্বিগুণ টাকা আত্মীয়াটির হস্তগত হইবে, কিন্তু বর্তমান সঙ্কট কাটাইয়া উঠিবার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না। হরিহর বাবু ধনী না হইলেও এই টাকার দায়িত্ব লইতে সমর্থ, কিন্তু তাঁহার কাছেও বর্তমানে টাকা নাই। হরিহর বাবু আত্মীয়াটিকে বলিলেন, আমি নিজে তো এখন এত টাকা দিতে পারব না, তবে আমি জামিন হয়ে তোমার জন্য এই টাকা জোগাড় করতে পারি কি না, একবার চেষ্টা করে দেখি। তোমার গহনা বন্ধক দেবার আমার মোটেই ইচ্ছে নেই।

হরিহর বাবু প্রথমে গেলেন তাঁহার পরিচিত একটি জমিদার মহাশয়ের বাড়ী। তিনি মনোযোগ দিয়া সব শুনিয়া বলিলেন, টাকাটা তো তেমন বেশী কিছু নয়, তবে কি না মেয়ে ছেলের ব্যাপার, বড় গোলমেলে।

হরিহর বাবু বলিলেন, সে জন্য তো আমিই জামিন হচ্ছি। ছ'মাসের মধ্যেই আপনি টাকা নিশ্চয় ফেরত পাবেন।

তা তো বুঝলুম, কিন্তু মেয়ে ছেলের ব্যাপার কি না। দেখি, ম্যানেজার বাবু কি বলেন।

এই বলিয়া তিনি ম্যানেজার বাবুকে ডাকাইলেন, এবং হরিহর

বাবুকে একটু বাহিরের ঘরে বসিতে বলিয়া ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হরিহর বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, শুনেছি মেয়েটির গয়নাগাটি অনেক আছে। তা হাজার কুড়ি টাকার গহনা যদি বন্ধক রাখে, তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

সুরমার কাছে—মেয়েটির নাম সুরমা—তাহার গহনাগুলির মূল্য যে কতখানি, এবং তাহার মূল্য যে শুধু টাকার দ্বারা নির্ণীত হয় না, এ কথা আর কেহ না জানিলেও হরিহর বাবু জানিতেন। তিনি জমিদার বাবুকে বলিলেন, দেখুন, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার জামিনে টাকাটা দেন, তাহলেই খুব ভাল হয়।

জমিদার বাবুর সহিত আরো দুই-চারটি কথা হইবার পর হরিহর বাবু নিরাশ হইয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

এর পর হরিহর বাবু তাঁহার বহু দিনের পরিচিত আর একটি বন্ধুর নিকট গেলেন। ইনি বিত্তশালী এবং ধার্মিক। পূজা, গঙ্গাস্নান, হরিনাম-কীর্তন প্রভৃতি লইয়াই সময় অতিবাহিত করেন। হরিহর বাবুর নিকট সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, ব্যাপার তো সবই বুঝছি, কিন্তু অতগুলো টাকা একটা মেয়েছেলেকে—

আমি তো জামিন হচ্ছি, আপনার কোন চিন্তা নেই।

তোমার সম্পর্কে অবশ্য আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই, কিন্তু—

আপনার ন্যায় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, মেয়েটির বিপদের কথা মনে করে যদি একটু বিবেচনা করে দেখেন তো খুব উপকার হয়। আপনার কাছে ও-ক'টা টাকা এমন আর বেশি কি?

না, টাকাটা আর এমন বেশি কি। তবে কি না—

আমি বলছি, আপনি কোন ভয় করবেন না। আপনার ধার্মিকতা,

আপনার উদারতা কে না জানে? এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে মেয়েটি আপনার কাছে চির-কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

তা তো বটেই, তা তো বটেই। কিন্তু—

আপনি আর বার বার কিন্তু-কিন্তু করবেন না। রাজি হোন, আমি রসিদের কাগজ-টাগজ নিয়ে আসি। আপনি যদি চান, তবে ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখে রেজেষ্ট্রিও করে নিতে পারেন।

সে তো হতেই পারে, সে তো হতেই পারে, কিন্তু—

হরিহর বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া ধার্মিক বন্ধুর ধর্মভাব বিকশিত করিয়া তাঁহার অন্তর্লোকে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার কিন্তুর নিরসন কিছুতেই হইল না। তিনি সর্বশেষে বলিলেন, সবই বুঝছি, আমার টাকাটা যে যথাসময়ে ফেরত পাব, সে সম্বন্ধে আমার মনে কোন সংশয় নেই, কিন্তু—

হরিহর বাবু, 'আচ্ছা, নমস্কার' বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

হরিহর বাবু বড়ই বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি সুরমাকে এক প্রকার কথা দিয়াছিলেন যে, ও-টাকাটা তিনি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন। তিনি অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহার পরিচিত একটি ধনী ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহেশ বাবুর সহিত হরিহর বাবুর পরিচয় বিশেষ ঘনিষ্ঠ নহে। তবে পরস্পরকে চেনেন এবং ব্যবসায়-সংক্রান্ত অনেকগুলি ব্যাপারে ইঁহারা একযোগে কাজ কর্ম করিয়াছেন। এই ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি এত ধনী যে, নয় হাজার টাকা ইঁহার নিকট অতি তুচ্ছ। হরিহর বাবু ইঁহার নিকট সব কথা বলিলেন। তিনিও মনোযোগ দিয়া সব শুনিলেন। পরে বলিলেন, অবশ্য টাকাটা কিছুই নয়, সামান্য নয় হাজার টাকা। কিন্তু—

হরিহরবাবু মনে মনে বলিলেন, আবার সেই কিন্তু।

মহেশ বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, দেখুন, এ টাকাটা দিতে পারলে খুবই খুসী হতুম। কিন্তু সম্প্রতি সাড়ে পঁচিশ লাখ টাকার কয়েকটা কনট্রাক্ট হাতে এসেছে। তাতেই আমাকে খুব বিব্রত হতে হচ্ছে। এ সময়ে আমার পক্ষে কাহাকেও টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।

হরিহর বাবু বলিলেন, এই সামান্য টাকা, তাও আপনি ছয় মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই পাবেন। এতে আপনার বড় বড় কনট্রাক্টের গায়ে একটু আঁচড়ও পড়বে না। আমার এই বর্ত্তমান বিপদ থেকে আপনি একটু উদ্ধার করুন।

আজ্ঞে, আমি খুবই দুঃখিত। আপনাকে এ বিষয়ে আমি কোন সাহায্য করতে পারলুম না।

হরিহর বাবু নমস্কার করিয়া সেখান হইতে বিদায় লইলেন।

সুরমা মাঝে মাঝে খবর লইতেছে, হরিহর বাবু কিছু করিতে পারিলেন কি না। হরিহর বাবু কুন্ঠিত ভাবে জানাইতেছেন, এখনও কিছু কিনারা করিতে পারেন নাই।

কোথায় কাহার নিকট যাওয়া যাইতে পারে, হরিহর বাবু শুধু এই চিন্তাই করিতেছেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল এই অঞ্চলের তিনকড়ির কথা। তিনকড়ি লোকটাকে সবাই বলে, লোকটা একেবারে বাজে, তবে মনটা ভাল। তিনকড়ি কি করে, এবং কি করে না, তৎসম্বন্ধে কাহারই মনে কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। সকলেই দেখে তিনকড়ি সর্ব্বদাই খুব ব্যস্ত। আবার ভীষণ আড্ডাধারীও বটে। তাসের আড্ডা, গানের জলসা, নাচের আসর, সর্বত্রই তিনকড়ি। ধনী না হইলেও পয়সা-কড়ি আছে। চাল-চলন কথা-বার্ত্তা শুনিলে মনে হয়, মনে আনন্দও আছে। হরিহর বাবু ভাবিলেন, তিনকড়িকে একবার কথাটা জানাইলে কেমন হয়। অত টাকা তাহার আদৌ

আছে কি না এবং তাহা শুধু হরিহর বাবুর জামিনে ধার দিবে কি না, সে বিষয়ে হরিহর বাবুর মনে খুবই সন্দেহ। তবু অনন্যোপায় হইলে মানুষ অসম্ভবকেও সম্ভব মনে করে।

হরিহর বাবু গেলেন তিনকড়ির বাসায়। শুনিলেন, তিনকড়ি একটা নাচের জলসায় গিয়াছে। কখন ফিরিবে কেহ বলিতে পারে না। গরজ বড় বালাই। হরিহর বাবু ঠিকানা জানিয়া লইয়া সেই নাচের আসরে গিয়া তিনকড়ির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনকড়ি সব শুনিয়া হরিহর বাবুর সঙ্গিত বাহিরে আসিয়া একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। হরিহর বাবুকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর গেল এবং স্ত্রীকে বলিল, চেকবইখানা দাও তো।

কেন, এখন চেক-বই কি হবে?

দাও না, আমার কথা বলবার সময় নেহ।

কেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

আবার দেরি করে! চেক-বইটা দাও, আর তুমি তৈরি হয়ে নাও। নাচটা বেশ জমেছে। তুমিও দেখে আসবে চল।

তিনকড়ির স্ত্রী চেক-বই আনিয়া দিয়া কাপড় পরিতে গেল।

তিনকড়ি বাহিরে আসিয়া হরিহর বাবুকে বলিল, ক্রস্‌ড্‌ চেক দেবো, না অমনি বেয়ারার চেক দেবো।

বেয়ারারই দাও।

এই নিন।

একটা রসিদ—

কি যে বলেন, আপনার কাছ থেকে আবার রসিদ! আ' আমাকে না চিনলেও আমি আপনাকে চিনি।

সত্যিই তোমাকে চিনতুম না, তিনকড়ি।

তিনকড়ির স্ত্রী সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়া পড়িতেই হরিহর বাবু চেকখানি পকেটে করিয়া বিদায় লইলেন। তিনকড়ি সস্ত্রীক জলসা অভিমুখে যাত্রা করিল।

নির্ধারিত দিনে হরিহর বাবু সুষমার নিকট হইতে টাকা লইয়া তিনকড়িকে দিয়া আসিয়াছেন। টাকা শোধ হইয়াছে। কিন্তু ঋণ শোধ হইয়াছে কি?

এপ্রিল ১৯৪৫

চিনস্থরা

হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া বিমল বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি টিকিটঘরের দিকে ছুটিয়া গিয়া একখানি টিকিট কোনমতে কাটিয়া ছুটিল প্ল্যাটফর্মের দিকে। শনিবারের বিকালের ভীড়। ভীড় ঠেলিয়া প্ল্যাটফর্ম বাহিয়া ট্রেনের দরজা খুলিয়া একটু বসিবাব স্থান করিয়া লইতেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

একটু হাঁফ ছাড়িতেই বিমল দেখিতে পাইল, একখানি বেঞ্চ পরেই তাহার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে অণিমা। অণিমা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়ে বিমলের এক ক্লাস নীচে। ফুটপাথে, কলেজের বারান্দায়, লাইব্রেরীতে দেখিয়াছে অনেকবার কিন্তু কখনও কথা হয় নাই। ট্রেনে অপ্রত্যাশিতভাবে উভয় উভয়কে দেখিয়া একটু স্মিত হাসি না হাসিয়া পারিল না। অপরিচিত এবং অনাহুত হইলেও কলেজের একটা স্বাভাবিক ও আন্তরিক আত্মীয়তা ট্রেনের সম্পূর্ণ একটা অপরিজ্ঞাত যাত্রীদলের মধ্যেও উভয়ের মনেও অতিপরিচয়ের তুলি বুলাইয়া দিল।

লিলুয়ায় কয়েকজন যাত্রী নামিয়া গেল। বেলুড়ে আরও কয়জন। বিমলের সামনের বেঞ্চের একটু স্থান খালি হইলে সে অণিমার দিকে চাহিল। অণিমাও তাহার নিজ স্থানে একটু অস্বস্তিই বোধ করিতেছিল। বিমল সাহসে ভর করিয়া বলিয়া ফেলিল, এখানে এসে বসবেন?

অণিমা প্রায় প্রস্তুতই ছিল। উঠিয়া আসিয়া বিমলের সম্মুখে বসিল।

হঠাৎ ট্রেনের এক কোণ হইতে একটা চীৎকাব শোনা গেল। পবক্ষণেই বুঝা গেল চীৎকাব নয়, বক্তৃতা। তাবপবেই জানা গেল বক্তৃতা নয়, বিজ্ঞাপন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি ক্যানভাসিং এবং সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ-বিক্রয়। টিনেব বাক্সে নানাপ্রকাব ঔষধ। একটির নাম অদ্ভুত মলম। ইহাতে যে সামান্য ব্রণ হইতে আবম্ভ করিয়া সাংঘাতিক ক্যান্সার পর্যন্ত সাবে, সেই কথাটাই বক্তৃতা দ্বারা প্রাঞ্জলভাবে বুঝানো হইতেছে। শুধু তাই নয়, এই মলম মনে লাগাইলে মনের ক্ষতও অবিলম্বে নিরাময় হইবে, এরূপ আশ্বাসও দেওয়া হইতেছে।

বিমল বলিল, কিনবো নাকি একটি কৌটা মলম ?

কেন ? আপনার মনে কোন ক্ষত আছে নাকি ?

কি যে বলেন ! বয়ে গেছে আমাব মলম কিনতে।

গাড়ী শ্রীরামপুর পার হইল। বিমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাবেন ?

চুঁচুড়ায়।

কেন ?

এমনি। আমার এক দূরসম্পর্কের মামীমা আছেন ওখানে। অনেকদিন থেকে লিখছেন আমাকে যেতে। আজকাল করে যাওয়া হয়নি। আজ বেরিয়ে পড়লুম। আবার সোমবারেই ফিবব।

আবার হঠাৎ গাড়ীর কোণে একটা চীৎকার কিংবা বক্তৃতা, কিংবা বিজ্ঞাপন। বক্তার বক্তব্য বেশি নয়। তিনি যাত্রীদিগকে বুঝাইতেছেন তাঁহার হাতে যে ক্ষুদ্র লম্বা পদার্থটি দেখা যাইতেছে, তাহা অতি আশ্চর্য পদার্থ। ইহা দ্বারা কুমারীরা তাঁহাদের ওষ্ঠদ্বয় রঞ্জিত করিতে

পারেন, বধূরা পায়ে আলতা পরিতে পারেন, আধুনিকারা আঙ্গুলের নখ রঙ্গাইতে পারেন, স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ম্যাপ অঁাকিতে পারেন এবং ছেলেবুড়ো সকলেই প্রয়োজন হইলে দোয়াতে গুলিয়া লাল কালির কাজ চালাইতে পারেন।

বিমল বলিল, কিনবেন একটা ?

কেন ? আমাকে কি কখনো ঠোঁটে রং মাখতে দেখেছেন ?

না, তা দেখিনি। তবে ওতে আরো কত কাজ হয় শুনলেনই তো।

বেশ আপনার ইচ্ছে হয়ে থাকে, কিনুন একটা।

বিজ্ঞাপনের চীৎকার একটু কমিতেই হঠাৎ একটা প্রচণ্ড গোছের রামপ্রসাদী সুর গাড়ীর যাত্রীদের কানে রীতিমত একটা ধাক্কা দিয়া ঘরখানিকে ছাইয়া ফেলিল।

অণিমা বলিল, এ গাড়ীটা তো বেশ। গানেরও ব্যবস্থা আছে।

তাইতো দেখছি। শুধু গান নয়, ওর সঙ্গে তাল দিচ্ছে দুটো পাথরের না লোহার করতাল।

গান থামিল, গায়ক ঘুরিয়া আসিয়া উহাদের সম্মুখে হাত পাতিল। বিমল একটা আনি ফেলিয়া দিল তাহার হাতে। আর কেহ কিছু দিল বলিয়া মনে হইল না। গায়কটি হয়তো এ গাড়ীর অতি পুরাতন সুপরিচিত আর্টিষ্ট। সেও কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গাড়ীর দরজা একটু খুলিয়া পা-দানির উপরে বসিয়া রহিল। আগামী ষ্টেশনে নামিয়া গাড়ীর অন্য ঘরে যাইবে।

অণিমা এতক্ষণ নিজে কোন কথা বলে নাই। এবার আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল আপনি কতদূর যাবেন ?

আমিও চুঁচুড়ায়।

কথাটা অণিমার ভাল লাগিল না। বিমলও ঠিক চুঁচুড়ায় যাইবে কেন? ইনি কি তাহাব বাড়ী হইতেই বা হাওড়া ষ্টেশন হইতেই পিছু লইযাছেন? এতক্ষণ তাহার যে স্বাভাবিক আনন্দ ও স্বচ্ছন্দতা ছিল, সহসা তাহা লুপ্ত হইযা গিযা তাহাব স্থলে আসিল একটা আড়ষ্টতা—একটা শঙ্কা। সে একেবাবে চুপ কবিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল।

বিমল বলিল, আমার এক পিসিমা আছেন চুঁচড়ায। অনেক-দিন থেকে লিখছেন একবাব যেতে। আজকাল কবে যাওয়া হযনি। ভাবলুম একবাব ঘুবেই আসি। আবাব সোমবাবেই ফিবব।

অণিমা মনে মনে শিহবিযা উঠিল। ঠিক তাহারই কথাগুলি অবিকল বলিয়া ফেলিলেন। শুধু মাসীমাব বদলে পিসিমা। কি মুস্কিলেই পডা গেল! কোন কাবণে যদি মাসিমা ষ্টেশনে না আসেন। ষ্টেশন থেকে সহর তো অনেক দূব। ইনি যদি এমনি করিয়াই পিছু লাগিয়া থাকেন। এমনি সব কথা অণিমার মনেব মধ্যে আসিয়া তোলপাড় করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে তাহাদের দুই বেঞ্চি পরে মহা তর্ক ও কলবব উঠিয়াছে। ইঁহারা কলিকাতায় ঘোড়াতীর্থে স্নান করিয়া ফিরিতেছেন। অনেকেরই কপালের উপবে ঘোড়াব পিছনের খুরের দাগ আঁকা। কেহ টুপি দিয়া, কেহ চাদর দিয়া, কেহ বা বক্তৃতা দিয়া তাহা ঢাকিয়া তুমুল উৎসাহে সেই পুণ্যতীর্থের বিবিধ লীলা বর্ণনা করিতেছেন।

বিমল এই সকল অদ্ভুত বাক্যালাপ শুনিয়া হাসিতেছে। কিন্তু অণিমার মনে শান্তি নাই! সে মনে মনে ভাবিতেছে, আবার হাসা হচ্ছে। মনে মনে দুষ্ট বুদ্ধি, আর বাইরে দেখানো হচ্ছে যেন কিছুই জানেন না। উঃ, যদি মাসীমা ষ্টেশনে না আসেন!

দরজা খুলিয়া একটি ঝাঁকা মাথায় করিয়া একটি লোক উঠিতেই ট্রেনের অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, কি হে, কত করে ?

বিমল চাহিয়া দেখিল, ঝাঁকায় কলা রহিয়াছে। ঝাঁকাওয়ালা বলিল, তিন পয়সা ডজন।

তিন পয়সা ডজন ! আজকালকার বাজারে কোন জিনিস তিন পয়সা ডজন আছে ? কিন্তু সে ত সত্যই তিন পয়সা ডজনই চাহিতেছে।

বিমল বলিল, দেখি তোমার কলা।

লোকটি ঝাঁকা নামাইল। কলাগুলি দেখিয়া বিমল বিস্মিত হইল। প্রথমেই মনে হইল কলাগুলি বুঝি মোচার ভিতর হইতে বাহির করা হইয়াছে। কিন্তু পাকিল কেমন করিয়া ? অণিমাব দিকে চাহিয়া বলিল, দেখুন তো পাকা কলা এতটুকু হ'ল কি করে ?

অণিমাও তাহার গম্ভীর্য ভুলিয়া বলিযা ফেলিল, তাইতো, এতটুকু কলা পাকলো কি করে ?

এ বোধ হয় ধোঁয়া-টোয়া দিয়ে জোর করে পাকার মত রং করে আনা হয়েছে।

ঝাঁকাওয়ালা সংক্ষেপে বলিল, খেয়েই দেখুন না।

বিমল দু'পয়সা দিয়া আটটী কলা কিনিল। একটি খাইয়াই বলিল, বাঃ খাসা কলা তো। এ যে বেশ গাছ-পাকা কলাই দেখছি।

অণিমার দিকে চাহিয়া বলিল, দেখুন না একটা খেয়ে।

একটু ইচ্ছা আর একটু অনিচ্ছার সঙ্গে অণিমা একটি কলা ছাড়াইয়া খাইতে লাগিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কি ভয়ানক লোক ! খাইয়ে দাইয়ে আমার মন ভোলাতে চায়। কি কুক্ষণেই এ গাড়ীতে চড়েছিলাম। উঃ, যদি মাসীমা ষ্টেশনে না আসেন !

গাড়ী চন্দননগর ছাড়িয়াছে। বিমল বলিল, এইবার চুঁচুড়া। গাড়ী নাকি বেশিক্ষণ থামে না। চট করে নেমে পড়্‌বেন।

অণিমা ভাবিল, চট করে নেমে পড়ব বই কি! আর উনি খপ করে হাত ধরে নিয়ে রিকশয় উঠবেন। উঃ, যদি মাসিমা না আসেন!

গাড়ী ধীরে ধীরে প্ল্যাটফরমে ঢুকিল। গাড়ী থামিতেই আগে অণিমা নামিল, পরে নামিল বিমল। দুইজনেই একটু এদিক ওদিক চাহিয়া ওভার-ব্রীজের দিকে অগ্রসর হইল। একটু আসিয়াই বিমল বলিয়া উঠিল, ওই যে আমার পিসিমা ষ্টেশনে এসেছেন আমাকে নিতে।

অণিমা বলিল, বা-রে, উনিই তো আমার মাসিমা!

উহারা নিকটে যাইতেই মাসিমা-পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, কি রে একেবারে এক ট্রেনেই যে! বিমলের দিকে চাহিয়া অণিমাকে বলিলেন, এর কথাই তো তোকে লিখেছিলুম! আর অণিমার দিকে চাহিয়া বিমলকে বলিলেন, এর কথাই তো তোকে বলেছিলুম!

বিমল ও অণিমা একসঙ্গেই নীচু হইয়া মাসীমা-পিসিমাকে প্রণাম করিল। তারপরে তিনজনে ধীরে ধীরে ওভার-ব্রীজের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। বিমল ও অণিমা পরস্পরের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল কিনা, অপরাহ্নের রক্তিম আলোকে তাহা দেখা গেল না।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫

চেঞ্জ

পূজার ছুটী; অতি প্রত্যূষে দিল্লী এক্স্প্রেস্ শিমুলতলা ষ্টেশনে থামিবামাত্র ইণ্টার ক্লাশের একটি প্রকোষ্ঠ হইতে অনিল তাহার স্ত্রী অলকা, শিশুকন্যা লীলা এবং কতকগুলি জিনিষপত্রসহ হুড়মুড় করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর নামিয়া পড়িল। ট্রেনখানি একটু পরেই ঝাঝার দিকে ছুটিল।

অলকা কহিল, কটা জিনিষ নামল, গুণে দেখ না! অনিল গণিল এক, দুই, তিন,—একুশ—ঠিক আছে। অলকা কহিল, তোমার হাতে ও ছাতাটা কার?

তাই ত! আর কার ছাতার সঙ্গে বদলে গেছে।

এখন আর ভেবে কি হবে? দেখি, কেমন ছাতা—যাক, তুমি ঠক নি।

চেঞ্জে এসে প্রথমেই ছাতা-ইণ্টারচেঞ্জ।

উভয়েই হাসিয়া উঠিল। জিনিষপত্র গরুর গাড়ীতে বোঝাই হইল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, কোন কোঠী বাবু?

অনিল বলিল, মর্ম্মর কুটীর।

তার পর সে লীলাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং অলকার সঙ্গে ষ্টেশনের পশ্চিম দিক দিয়া মজিলপুর লজের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে

অগ্রসর হইল। কিছুদূর গিয়াই অলকা বলিল, এই নূতন জুতোজোড়ায় আমার পায়ে বড় লাগছে। একটু যেন ছোট হয়েছে, মনে হয়।

তা হবেই ত। সেবার আমি পায়ের মাপ নিয়ে কিনে দিয়েছিলাম, তাই ঠিক হয়েছিল। এবার স্বয়ং কলেজ ষ্ট্রীটে গিয়ে কিনে আনা হয়েছে, তাই ছোট হয়েছে।

আচ্ছা, বেশ! উঃ, আমি আর হাঁটতে পারবো না।

তবে গরুর গাড়ীতে চড়।

না, সেও হবে না।

তবে জুতাজোড়া খুলে দাও—আমি পকেটে রেখে দি। খালি পায়ে হেঁটে চল। আর ত বেশী দূর নেই।

তাহাই হইল। খানিকদূর অগ্রসর হইতেই বিপরীত দিক হইতে যে যুবকটি আসিয়া অনিলকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার নাম বিমল। সেও কয়েকদিন পূর্ব্বে সস্ত্রীক এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে। বিমল কহিল, বাঃ, এখানে আসছ, তা আমাকে একবার জানালে কি দোষ হত?

তুমি যে এখানে এসেছ, সে কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। যাক, তুমি আছ কোথায়?

খাপরা-প্রাসাদে। এখান থেকে বেশী দূর নয়। বেশ সস্তায় একখানা বাংলো গোছের বাড়ী পাওয়া গেছে। আচ্ছা, এখন আসি—বাজারের দিকে যাচ্ছি—পরে আবার দেখা হবে।

এত সকালে বাজারে যাচ্ছ কেন?

সকালে না গেলে মাছ পাওয়া যাবে না। তুমি যে গাড়ীতে এলে এই গাড়ীতে কিছু মাছ আসে। দশ পনের মিনিটের মধ্যেই সব লুট হয়ে যায়। তুমি উঠছ কোথায়?

মর্ম্মর-কুটীরে। তুমি বাড়িটা চেন?

খুব চিনি। আমাদের বাসার কাছেই। আচ্ছা, তুমি এখন গিয়ে ঘরকন্না গোছাও। বিকেলে তোমার ওখানে যাব'খন।

দুই

বাসাটা অলকার বেশ পছন্দ হইয়াছে। কলিকাতায় অপবিসর গলির ভিতব হইতে এখানে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। বাড়ীর সংলগ্ন বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ—ছোট প্রাচীর দিয়া ঘেরা। তার মধ্যে আম, পেয়ারা, ডুমুর, আমলকী, নিম, করঞ্জা প্রভৃতি নানাপ্রকার গাছ। বাড়ীর সামনের দিকে দুই সারিতে কতকগুলি বেলফুল ও চামেলীর ঝাড়। গেটের দুই পাশে দুইটি বড় হাসনা হানার ঝোপ।

জিনিষপত্র গুছান হইয়া গিযাছে। বড় একখানা ঘর শোবার জন্য এবং আর একখানি বসিবার জন্য স্থির হইয়াছে। কোন আসবাব নাই। দুইখানা মলিন চেয়ার, একখানা বেঞ্চ, এই বাড়ীতেই ছিল। বাড়ীর মালিককে বলিয়া কহিয়া একখানা ইজি চেয়া'র এবং একখানা ছোট টেবিল সংগ্রহ করা হইয়াছে। সে তাহার পরিচিত একটি লোককে আনিয়া এ' বাড়ীতে চাকররূপে ভর্তি করিয়া দিয়াছে। সে চাকর ও বামুন উভয়েরই কাজই করিতেছে। অলকা শুধু তত্ত্বাবধান করিতেছে।

বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে কাপড়-চোপড় পরিয়া টেবিলের পাশে উভয়ে বসিয়াছে। চাকর টিকুয়া চা আনিতে গিয়াছে। অনিল একটা বিস্কুটের টিন খুলিয়া লীলার হাতে একখানা দিয়াছে এবং

আর একখানায কামড় দিতেছে। এমন সময়ে বিমল বারান্দায় উঠিয়া হাঁকিল, অনিল !

এই যে এসেছ—বেশ। ওগো, এদিকে এস, দেখ কারা এসেছে।

অলকা বিমলের স্ত্রী রেণুকে পূর্ব্বে দেখে নাই। বিমলের বিবাহ হইযাছে, সে সংবাদ জানে, কিন্তু তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ এই প্রথম। রেণু অসামান্য রূপসী। যেমন দেহের বর্ণ, তেমনি চোখ মুখের শ্রী। একখানি চাঁপা রংযের ছাপা সিল্কের শাড়ীতে তাহাকে জীবন্ত লক্ষ্মীপ্রতিমার ন্যায় দেখাইতেছে। অলকা অগ্রসর হইযা রেণুর দুইখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিল—আসুন, আমার কি সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ হযে গেল।

আমাকে 'আপনি' বলবেন না অলকাদি, আমি আপনার কত ছোট।

আচ্ছা, তাহলে তুমিও আমাকে 'আপনি' বলতে পাবে না।

সকলেই ঘবে গিয়া বসিল। চেয়ার মাত্র দুখানা, তাই অনিল এবং অলকা বেঞ্চির উপরই বসিল। অনিল হাঁকিল, টিকুয়া, চার কাপ চা ক'রে নিয়ে আয়।

চা আসিল। গল্প চলিতে লাগিল। অনিল কহিল, আচ্ছা বিমল, তোমরা ত প্রায় এক সপ্তাহ এখানে এসেছ, কেমন লাগছে বল ত !

মন্দ কি। শহর থেকে এসে এখানে ত বেশ ভালই লাগছে।

খুব নির্জ্জন, না ?

তা নির্জ্জনই ভাল। মানুষের হট্টগোল ত বারমাসই আছে।

তা বটে। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, এতটা নির্জ্জনতা ভাল নয়। অন্ততঃ নিজ পরিবারেও লোকজন বেশী থাকলে অনেকটা ভাল লাগে।

কিন্তু ভাই, পিসী, মাসী, কাকী এ সব নিয়ে বেড়াতে আসার চেয়ে, মোটে না আসাই ভাল। এরা সব থাকলে এমন অবাধে বেড়ান বা বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় সব মাটী। এই দেখ না, যদি মা বা কাকীমা সঙ্গে আসতেন, তাহলে কি আর আমি নিঃসঙ্কোচে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আজ আলাপ কর্‌তে পারতাম, না তুমিই পারতে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে। এক দিনের আলাপে ত নয়ই। একমাসের মধ্যেও হয়ত হ'ত না।

তোমার বাড়ীর লোকেরা বুঝি খুব সেকেলে?

সংসারে যত রকম লোক, তত রকম মত। নাও, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। চা খাওয়া শেষ করে চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

অলকা কহিল, হাঁ, চল, এঁদের সঙ্গেই আজ বেরোনো যাক। আমরা ত কোন যায়গাই চিনি নে।

বিমল উত্তর দিল, এখানে চিনবার বিশেষ কিছু নেই। অতি ছোট জায়গা। দুদিন বেড়ালেই সব দেখা হয়ে যাবে। আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, সে আর কি বলব।

সেটা উভয়তই।

অতঃপর চারজনে বেড়াইতে বাহির হইল! লাল রাস্তা ধরিয়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। ষ্টেশনে একখানা ট্রেন আসিয়াছিল। তাহার যাত্রীদের ওঠানামার কলরব শেষ হইল। ট্রেন ছাড়িয়া দিল। যাঁহারা এখানে নামিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়টি ছেলে, কয়টি মেয়ে, তাহাদের লাগেজ কম কি বেশী, মেয়েরা সুন্দরী কি না, ইহারা চাকুরে না উকিল, ব্যারিষ্টার না জমিদার, প্রভৃতি নানা প্রকার অনুমান ও গবেষণা করিতে করিতে রেল লাইন পার হইয়া দোকানগুলির পাশ

দিয়া, পুকুরের পাড় ধরিয়া, লেভেল-ক্রসিং পার হইয়া ঢাকাই রোড ধরিয়া খানিকটা হাঁটিয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া আসিল। পথিমধ্যে পরস্পরের সহিত নানা প্রকার বাক্যালাপ হইল। বন্ধুপত্নীর সহিত বিমল বেশ মিষ্ট দুই চারিটি রসিকতাও করিল। রেণু তাহাতে একটু বিরক্ত হইলেও হাসি ও আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পাইল না।

উভয়ে বিদায় লইবার সময়ে স্থির হইল, আগামী শনিবারে হলদি ঝরণায় চড়ুইভাতি হইবে। দুপুরে সেখানে যাইবে এবং সন্ধ্যায় ফিরিবে।

অনিল ও অলকা বাসায় ফিরিয়া দেখিল লীলা কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করিয়া টিকুয়ার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

তিন

প্রত্যহ সকালে ও বিকালে ভ্রমণ দৈনন্দিন কাজ। পথে প্রায় দুবেলাই বিমল ও রেণুর সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হইলেই কিছুদূর পর্য্যন্ত একসঙ্গে ভ্রমণ, গল্প গুজব, হাসি ঠাট্টা চলে, পরে কেহ বা 'নীলাবরণের' দিকে চলিয়া যায়। বিদায়ের সময়ে উভয় পক্ষই উভয়পক্ষকে সানন্দ ও সাদর ভাষায় বিদায় দেয়।

সেদিন সকালে অনিলেরা গেল স্টেশনের দিকে। স্টেশন পার হইয়া 'ব্রীজের' উপর দিয়া লাট্টু পাহাড়ে যাইবে, তথা হইতে ফিরিয়া কিছু বাজার করিয়া পোষ্টাফিস হইতে খবরের কাগজ লইয়া, স্টেশনের দাঁড়িপাল্লায় ওজন হইয়া, রেলওয়ে ওভারব্রীজের উপর খানিকটা বিশ্রাম করিয়া বাড়ী ফিরিবে, এইরূপ ইচ্ছা।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেই তাহারা লাট্টু পাহাড়ে পৌঁছিল। অলকা কহিল, এটাকে লাট্টু পাহাড় বলে কেন ?

দেখতে যেন একটা লাট্টু উল্টা হয়ে আছে, তাই বোধ হয়।

পাহাড়ের উপর উঠিয়া নূতন সূর্য্যের আলোকে চতুর্দিকের পাহাড়ের সারি, তাহার মধ্যে অবস্থিত উঁচু নীচু ভূমি, বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত, লালরংএর আঁকাবাঁকা পথ, সাপের মত লম্বমান রেল পথ প্রভৃতি অতিশয় মনোরম দেখাইতেছিল। কিছুক্ষণ এই সকল আনন্দ উপভোগ করিবার পর তাহারা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। অলকা কহিল, আমার এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না।

সর্বদা এখানে থাকলে আর অত ভাল লাগবে না।

অর্থাৎ তোমার মতে, কাউকে বেশীদিন ভাল লাগে না।

আমি বুঝি তাই বলছি ? মানুষের সঙ্গে বুঝি অন্য জিনিষের তুলনা হয় ?

আচ্ছা, এখন তাড়াতাড়ি চল, রোদ উঠে পড়ল।

ষ্টেশনের নিকট আসিয়া তাহারা দেখিল, টিকুয়া খুকীকে কোলে লইয়া এখানে আসিয়াছে। বাজার হইতে কিছু ঢেঁড়স, একটা লাউ, সওয়া সের আলু, একসের কচু, আধসের কাটা কাতলা মাছ ও দুই পয়সার পান কিনিয়া দিয়া টিকুয়াকে এবং খুকীকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তারপর তাহারা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া, কোন বাড়ীর কাহারা বাজার করিতে আসিয়াছে সে সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যেই মন্তব্য করিয়া ষ্টেশনের প্লাটফরমে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দুজনেই ওজন হইয়া দেখিল, শিমুলতলার জল বায়ুতে গত তিনদিনের মধ্যে কোনই উন্নতি হয় নাই। ইতিমধ্যে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসিয়া পড়িল। কয়েকজন যাত্রী নামিল। একজনের

নিকট হইতে লাগেজ-বাবদ সাতটাকা ছয় আনা আদায় করিবার জন্য নীল পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে বিশেষ উদ্যোগী দেখা গেল। অলকা জিজ্ঞাসা করিল, ও কে ?

একজন ক্রু।

ক্রু কাকে বলে ?

যে যাত্রীদের কাছ থেকে ন্যায্য প্রাপ্য 'স্ক্রু' করে আদায় করে, তাকে 'ক্রু' বলে।

ও, বুঝেছি।

ইতিমধ্যে ওভারব্রীজটি স্ত্রীলোকে ভরিয়া গিয়াছে। দার্জ্জিলিংএ যেমন 'ম্যল', পুরীতে যেমন সমুদ্রতট, শিমুলতলায় তেমনি রেলওয়ে স্টেশন, বিশেষতঃ ওভারব্রীজ। অলকা কহিল, চল, ব্রীজের ওপর যাই।

না, আমি ওখানে যাব না। তুমি যাও, আমি ততক্ষণ পোষ্টঅফিস থেকে কাগজ খানা এনে প্ল্যাটফরমে একটু পায়চারি করি।

ব্রীজের উপর ছোট বড়, লম্বা বেঁটে, মোটা সরু, ফর্সা কাল, সুশ্রী কুশ্রী, সধবা, বিধবা, কুমারী, নানা প্রকারের প্রায় কুড়িটি মহিলা সমবেত হইয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইত যে ইঁহাদের মধ্যে দশ জনের নামই 'বীণা'। কেহ বা বীণাপাণি কেহ বা শুধু বীণা। অপর দশজনের নাম অলকা, বিমলা, আরতি ইত্যাদি।

সম্মুখেই সমবয়স্ক একটী তরুণীকে দেখিয়া অলকা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কতদিন এখানে এসেছেন ?

আজ ছয় দিন হল।

কেমন লাগছে ?

লাগছে ত ভালই। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার বড় কষ্ট। কিছু পাওয়া যায় না।

কেন, যা দরকার প্রায় সবই ত পাওয়া যায়।

আমি ত বাজার যাইনে, কিন্তু উনি বলছিলেন যে এখানে চাল, ডাল, নুন, তেল, মাছ, পাঁটা, মুরগী, ডিম, দুধ, ঘি, আলু, কপি. পটল, ঝিঙে, লাউ, কুমড়ো, শাক, কচু, ওল, লেবু, লঙ্কা, বেগুন, আদা, পেঁয়াজ, পেঁপে, ঢেঁড়স, মূলা আর পান, সুপারি—এ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। খাবার কষ্টে ওঁর শরীর রোগা হয়ে গেছে। আর আমারও, এই দেখুন, সেমিজটা ঢল্ ঢল্ করছে। উনি বলছেন, শিগ্‌গিরই আমরা মধুপুর বা দেওঘর চলে যাব।

আর একটু অগ্রসর হইয়া অলকা দেখিল, একটি মহিলা কি যেন সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছেন। উৎসুক হইয়া অলকাও পাশে গিয়া বসিল। মহিলাটি বলিতেছেন, 'কাল এক কাণ্ড হয়েছিল। দাদা আর বউদি, আমি আর উনি, বেড়াতে ত গেলাম নীলাবরণের দিকে। সেখানকার শুকনো নদীটার মাঝে, যেখানে সেই পাথরগুলো, সেখানে বসে খানিক গল্পগুজব ক'রে ফিরবার সময়ে দাদা বললেন, তোরা ঐ রেলপথ ধরে চলে যা—শীগ্‌গির হবে। আমরা ঐ মাঠের ভেতর দিয়েই ফিরে যাই। দেখি যদি ঐ বস্তিটার মধ্যে কিছু তরকারী টরকারী পাই ত নিয়ে যাব'খন। আমরা ত ফিরে এলাম। দাদা আর বউদির খোঁজ নেই। রাত আটটা বাজল, নটা বাজল, তবু খোঁজ নেই। কেউ বললে, ও দিকে মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয়। মা ত কেঁদেই আকুল। লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে উনি বেরিয়ে পড়লেন। মালীও বেরুল। আমাদের চাকরটাও বেরুল। কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। মাঠের মধ্যে ভীষণ অন্ধকার, চারিদিকে কোথাও কিছু দেখা যায় না। ডাক

দিয়েও সাড়া মেলে না। শেষে পাশের বাড়ীর একটা ছেলে তাদের পুরানো গ্রামোফোনের চোঙাটা নিয়ে মাঠের মাঝে গিয়ে চীৎকার করতে করতে তবে সাড়া পাওয়া গেল। রাত্রি এগারটার সময়ে তারা বাড়ী ফিরল। জিজ্ঞাসা করতে বললে, আমরা পথ হারিয়ে মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

একটি সুবেশা তরুণী হাসিয়া বলিলেন, কলকাতায় ত গড়ের মাঠ আর লেক ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখানে এসে আপনার দাদা ও বউদি সন্ধ্যার অন্ধকারে নিরালা মাঠে একটু না হয় পথই হারিয়েছেন, তাতে আপনারা অত ব্যস্ত হলেন কেন?

একটা হাসির রোল উঠিল। আরো নানাপ্রকার সুখদুঃখের কথা আলোচিত হইতে লাগিল। অলকা লক্ষ্য করিল একটি যুবতী বধূ কোনই কথা বলিতেছে না, কাহারো কথার জবাব দিতেছে না। শুধু যখন সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছিল, তখন ঠোঁটের বামকোণ দিয়া ঈষৎ মুচকি হাসিয়াই পুনরায় গম্ভীর হইয়া বসিতেছিল। তাহার পার্শ্বস্থ একটী কিশোরীকে অলকা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এঁকে চেন?

হ্যাঁ, উনি আমাদের পাড়াতেই থাকেন।

উনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না কেন?

উনি মস্ত বড় ঘরের মেয়ে কিনা, তাই বোধ হয়।

তাই নাকি?

বেলা হইয়া গিয়াছে। ব্রীজের নীচে হইতে অনিল ইঙ্গিত করিতেই অলকা অপর পারে গিয়া নামিল। অনিল নীচে দিয়াই রেললাইন পার হইয়া অলকার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের গেট পার হইল। অন্যান্য রমণীরা অলকার স্বামীটি কে তাহা একবার দেখিয়া লইল।

পথে আসিতে বিমলের সঙ্গে দেখা।

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, আজ আপনারা বেড়াতে বেরোন নি?

বিমল উত্তর দিল, না।

কেন?

ওঁর পায়ে ব্যথা হয়েছে, হাঁটতে পারছেন না।

তাই তো! ভাবছিলাম, আপনাদের আজ বিকেলে আমাদের ওখানে চা খেতে বলব। তা নিতান্ত যদি উনি না আসতে পারেন তবে আপনিই আসবেন। কেমন, আসবেন তো?

নিশ্চয়ই যাব। আপনার নিমন্ত্রণ কি আমি উপেক্ষা করতে পারি?

আচ্ছা, আসবেন কিন্তু।

চার

কয়দিন হইল, একটা জরুরী টেলিগ্রাম পাইয়া অনিল কলিকাতা গিয়াছে। অলকাও সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বিমল আশ্বাস দিল, তাহাদের একা থাকিতে কোন অসুবিধা হইবে না। সে সর্বদা দেখাশুনা করিবে। মালী রোজ রাত্রে বাড়ী যাইত, তাহাকে বলা হইল, অনিল না ফেরা পর্য্যন্ত সে বাসাতেই থাকিবে। যাইবার সময়ে অনিল, অলকাকে ভরসা দিয়া গেল, বিমল রয়েছে, তোমার ভয় কি?

বিকালে বিমল ও অলকা চা খাইতেছে। টিকুয়া খোকাকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছে। বিমলের স্ত্রী পাড়ায় আর এক বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছে।

দিনটি চমৎকার। পরিচ্ছন্ন আকাশের নীল আভা মিশিয়াছে নীচের

দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল মাঠের সঙ্গে। পশ্চিম গগনের ঈষৎ রক্তিম আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে উঠানে বারান্দায় চায়ের টেবিলে আর অলকার মুখে। উঠানে দেওয়ালের পাশে এবং উঠানের মধ্যস্থিত পথের দুই পাশে ফুল গাছের সারি। সেগুলির উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে প্রজাপতি আর মৌমাছি। সমস্ত আকাশ বাতাস শরৎ ও হেমন্তের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া যেন হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

অলকা ও বিমল চা খাইতেছে এবং গল্প করিতেছে। বিমল একটা বড় কোম্পানীর ক্যানভাসার। কার্যোপলক্ষে তাহাকে সারা বৎসর নানা স্থানে ঘুরিতে হয়। ভারতের বহু স্থানে সে ঘুরিয়াছে। সেই সকল স্থানের কত বিবরণ একের পর এক বলিয়া যাইতেছে আর অলকা মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে। তাহার সহিত নিজের জীবন যাত্রার কত প্রভেদ। আজ তিন বৎসব ধরিয়া জল্পনা কল্পনা করিয়া, কত অসুবিধা সহিয়া, কত আত্মীয়স্বজনের মুখ ভার সহিয়া তবে এবার অলকা একটু বাহির হইতে পারিয়াছে। তাও অনিলের স্বাস্থ্যের জন্যই, নিতান্ত সখ করিয়া পয়সা খরচ করিবার জন্য নয়।

বিমলের কথার ফাঁকে অলকা একবার বলিয়া ফেলিল, আপনি কি ভাগ্যবান, বিমলবাবু।

বিমল একটু যেন গম্ভীর হইয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, হ্যাঁ, কিন্তু—

কিন্তু কি? আপনি সর্বদা একা একাই ঘোরেন, স্ত্রীকে সঙ্গে নিতে পারেন না। তাই দুঃখ করছেন? সত্যি, আপনার এটা কিন্তু অন্যায়। সম্ভব হলেই ওঁকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত।

হ্যাঁ—উচিত বই কি—নিশ্চয়ই উচিত।

আপনার স্ত্রীটি সত্যি কি চমৎকার। সেদিক দিয়েও আপনার

মত ভাগ্যবান কয়জন? পাড়ার লোকে আপনার স্ত্রীকে কি বলে জানেন?

কি বলে?

বলে, কুইন অফ্ শিমুলতলা। এই কয়দিনেই পাড়ার মেয়েরা বউরা ওঁকে একেবারে আপন করে ফেলেছে।

বিমল একটু চুপ করিয়া রহিল। তাহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে অলকাও যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল। একটু পরে বিমল বলিল, আমার কুইন কিন্তু আপনি।

অলকা যেন সহসা তড়িতাহত হইল। কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা বলিল না। বিমল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা, আজ আসি তাহলে। কাল আবার আসব।

পাঁচ

পরদিন কলিকাতায় অনিলের বাসার সামনে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া থামিল। অনিল সবিস্ময়ে দেখিল, অলকা খুকীর হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিতেছে। গাড়ীর মাথায়, পিছনে, সামনে, ভিতরে জিনিষপত্রের পাহাড়।

অনিলের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, ব্যাপার কি? হঠাৎ আজই? জ্যাঠামশায় তো একটু ভালই আছেন। আমি তো দু' এক দিনের মধ্যেই ফিরে যাচ্ছিলুম।

অলকা চুপে চুপে বলিল, বিরহ সহ্য হ'ল না।

কি যে বল! এত খরচপত্র করে এত ঝঞ্ঝাট সয়ে একটু চেঞ্জের ব্যবস্থা করলুম, তা দিলে সব গোলমাল করে।

বেশ করলুম। নাও, এখন জিনিষপত্রগুলো নামাও।

কি করে এলে একা-একা এত সব জিনিষপত্র নিয়ে?

দেখতেই তো পাচ্ছ, এসেছি। মেয়েদের তোমরা যতটা সরলা আর অবলা ভাব, আমরা তা নই।

খরচপত্রের কি করলে? তোমার কাছে তো বেশি কিছু ছিল না।

দুগাছা চুড়ি স্টেশন মাস্টার মশায়ের কাছে রেখে, ওখানকার সব খরচপত্র মিটিয়ে এসেছি—মায় মালীর বক্‌শিস্ পর্যন্ত।

স্টেশনমাস্টার দিলেন?

বললুম, আমার স্বামীর ভয়ানক বিপদ, একটু উপকার করতেই হবে। তাছাড়া, চুড়ি দুগাছাও তো খাঁটি গিনি সোনার।

আমার ভয়ানক বিপদ? আমার আবার কি বিপদ হ'লো?

আমাকে কেউ ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেলে তোমার আর কি বিপদ?

তার মানে?

মানে পরে শুনো। এখন দেখো, জিনিষপত্রগুলো সব নামলো কিনা।

মে ১৯৪৫

তীর্থ

দেরাদুন এক্স্‌প্রেস।

ভয়ানক ভিড়। শতরঞ্জি ও কম্বলের একটা পুঁটুলি এবং একটা অ্যালুমিনিয়মের কুঁজা লইয়া কোন মতে গাড়ীতে উঠিলাম বটে, কিন্তু বসিবার স্থান পাইলাম না। গাড়ীতে প্রায় সকলেই অবাঙালী। থার্ডক্লাশে বাঙালী বেশি ওঠে না। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াই রহিলাম। কিন্তু কাশী হইতে হরিদ্বার, অনেক পথ। একটু বসিবার স্থান চাই।

চারিদিকে, মাথার উপরের তাকে, সর্বত্র নানা প্রকার জিনিষপত্র। অধিকাংশই বিছানা, পুঁটুলি, টিনের বাক্স, লাঠি, ছাতা, ঘটি প্রভৃতি। একপাশ হইতে আর একপাশ পর্যন্ত একেবারে ঠাসা। যাত্রীদের মধ্যে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী, বালক, বালিকা, এমন কি স্তনন্ধয় শিশুও আছে। শোওয়া, বসা, ঘুমান, খাওয়া প্রভৃতি সকল বিষয়েই শত কষ্ট, শত অসুবিধা ইহারা অম্লানবদনে সহিতেছে। ইহাদের সকলেরই মনের ভাব এই যে, কষ্ট না করিলে কেষ্ট পাওয়া যায় না। সুতরাং তীর্থদর্শনের পুণ্য লাভ করিতে এইটুকু কষ্ট তো সহিতেই হইবে।

এত অসুবিধার মধ্যেও পরস্পরের প্রতি একটা সহানুভূতির ভাব জাগিয়া আছে। কাহারও শিশুপুত্রের জন্য একটু স্থান করিয়া দেওয়া, কাহারও ঘটিতে জল না থাকিলে, অপরের পাত্র হইতে একটু জল দেওয়া, ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে কাহারও জন্য কোন জিনিষ কিনিয়া আনিয়া দেওয়া, প্রভৃতি বহুপ্রকার ছোটখাট কাজে ইহাদের প্রতিবেশী-সুলভ

সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, দুই বেঞ্চির মধ্যে মেঝেতেই আমার বিছানার পুঁটুলির উপর বসিয়া পড়িব মনে করিতেছি, এমন সময়ে, গাড়ীর অপর পার্শ্বে দূরে এক কোণে দুইটি বাঙালী যাত্রী দেখিতে পাইলাম। মনটা একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অনেক কষ্টে অন্য যাত্রীদের ভিড় ঠেলিয়া উঁহাদের নিকট গিয়া সবিনয়ে বলিলাম, একটু বসবার জায়গা হবে? স্বামী এবং স্ত্রী, কেহই উত্তর দিলেন না। ভদ্রলোকটির পাশে একটু স্থান করিবার চেষ্টা করিতেই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, করেন কি মশাই, গায়ের উপর বসবেন নাকি? মহিলাটি যেদিকে ছিলেন, সেদিকে সরিয়া আসিতেই, ভদ্রলোকটি পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কেমনতর ভদ্রলোক আপনি? মহিলাটি আমার মাতার বয়সী। সসম্ভ্রমে উভয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ঐস্থান হইতে সরিয়া আসিলাম।

দুই

হরিদ্বার।

শরীরটা এমনই ভাল ছিল না। তারপর ট্রেনের ভয়ানক কষ্ট। প্রায় আধমরা হইয়া হরিদ্বার ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। প্ল্যাটফর্মেই খানিক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া, আস্তে আস্তে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিলাম। দ্রুত-প্রবহমান নির্মল শীতল জল এবং নদীর দুই পাশের পাহাড়ের দৃশ্য দেখিয়া মনটা যেন জুড়াইয়া গেল। শরীরের অসুস্থতা ভুলিয়া প্রাণ ভরিয়া স্নান করিলাম। একটা দোকান হইতে কিছু খাবার কিনিয়া দাম দিবার সময় দেখি, খুচরা পয়সা নাই। দোকানী বলিল, পরে

দিয়ে যাবেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে এরূপ বিশ্বাস করিতে অন্য কোথায়ও দেখি নাই। কিছু আহারের পর, বিছানার পুঁটুলিটা একটা ধর্মশালায় তত্ত্বাবধায়কের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া, এদিক ওদিক একটু ঘুরিয়া পুনরায় গঙ্গার ধারেই আসিয়া বসিলাম। এ স্থানটা এত ভাল লাগিতেছিল যে অন্য কোথাও যাইতে মন সরিতেছিল না। যুগ যুগ ধরিয়া কত নরনারী পুণ্য সঞ্চয়ের আশায়, মনের অশান্তি ঘুচাইবার আশায় অথবা শুধু এই পুণ্যতীর্থের স্পর্শ ও সঙ্গলাভের আশায় এইখানে এই গঙ্গার তীরে কত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিয়াছে তাহার সংবাদ কে রাখে!

মন চাহিলে কি হইবে! শরীরটা ক্রমশঃ আরো অসুস্থ বোধ হইতে লাগিল। একটু যেন জ্বরই হইয়াছে। সন্ধ্যার পূর্বেই ধর্মশালায় ফিরিলাম। বিছানার পুঁটুলি বগলে লইয়া একখানি ঘরের সন্ধান করিতেই, জানিতে পারিলাম, বর্তমানে কোন ধর্মশালায়ই ঘর খালি নাই। এমন কি, অনেকে স্ত্রীপুত্রাদি সহ বারান্দায় বা উঠানে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। উপায় কি? আমিও দোতলায় উঠিয়া বারান্দার একপাশে বিছানার পুঁটুলিটা খুলিয়া, শতরঞ্চিটা ভাঁজ করিয়া মাটিতে পাতিয়া, কম্বলটাকে সর্বাঙ্গে জড়াইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিলাম। বেশ একটু জ্বরই হইয়াছে।

একটু পরে দেখি ট্রেনের সেই স্বামী-স্ত্রী ঠিক পাশেরই একটি ঘরের তালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিলেন। হারিকেন জ্বালিয়া মহিলাটি বাহিরে আসিতেই আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, আপনি?

হ্যাঁ।

তা অমন ক'রে ওখানে বসে আছেন কেন?

কোন ঘর খালি পাই নি। শরীরটাও ভাল নেই।

কেন, কি হয়েছে আপনার ?—এই কথা বলিয়া তিনি আমার কপালে হাত দিয়া বলিলেন, এতো বেশ জ্বর হয়েছে দেখছি।

ঘরের ভিতর গিয়া তাঁহার স্বামীর সহিত কিঞ্চিৎ আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, আপনি যান তো ঘরের মধ্যে। ওখানেই আপনার বিছানা করা হয়েছে।

সে কি ? আপনারা ?

আমরা বাইরে ব্যবস্থা করছি।

সে কি হয় ? আপনারা সারারাত বাইরে শোবেন কি ক'রে ?

আমাদের তো অসুখ হয়নি। কোন কষ্ট হবে না। আজ সারারাত অমন ক'রে বাহিরে থাকলে আপনার নিউমোনিয়া হবে। আর দেরি করবেন না। যান ভিতরে।

ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর হইতে ভদ্রলোকটি বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে এক প্রকার টানিয়াই ভিতরে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিলেন। উঁহারা বিছানাপত্র লইয়া বারান্দায় শুইবার ব্যবস্থা করিলেন।

শুইয়া শুইয়া জ্বরে কাঁপিতেছি আর ভাবিতেছি, মানুষের মন !

আগাষ্ট, ১৯৪২

ক্ষতি

ইভ্যাকুয়েশনের গোলমালে আমার ঘড়িটি হারাইয়াছে। কোথায় কি ভাবে গেল, এখনও তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। ট্রেন হইতে নামিয়া নূতন বাসায় পৌঁছিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া, বাজার করিয়া, কোন মতে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া, ক্লান্ত শরীর ও মন লইয়া একটু বিশ্রাম করিতেছি—আর আমার ঘড়িটার কথাই ভাবিতেছি।

মনে পড়ে, প্রায় তের বৎসর আগে ডালহাউসি স্কোয়ারের একটা বড় দোকানে গিয়া, ক্যাটালগ ঘাঁটিয়া, অনেক পছন্দ করিয়া, আধুনিক ডিজাইনের একটা আঠারো-ক্যারাট সোনার ঘড়ি কিনিয়া বাঁ-হাতের কব্জিতে পরিয়াছিলাম! ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, দেখিয়া শুনিয়া কত আনন্দ কত তৃপ্তি সেদিন পাইয়াছি। তারপর হইতে এই দীর্ঘ তের বৎসর কখনও ঘড়িটিকে হাত-ছাড়া বা কাছ-ছাড়া করি নাই।

বাড়িতে বসিয়া কাজ করিবার সময়ে ঘড়িটিকে টেবিলের উপরে চোখের সামনেই রাখিয়াছি। অফিসের বেলা হইবে ভয়ে সাড়ে নয়টার পরে ঘন ঘন ঘড়ির কাঁটার দিকে চাহিয়াছি। কখনও কদাচিৎ ঘড়ির কাঁটা অচল দেখিলে, দম দেওয়া হয় নাই বলিয়া নিজেকে ভর্ৎসনা করিয়াছি। প্রতিদিন বেলা একটার সময়ে তোপের সঙ্গে নিয়মিত সময় মিলাইয়াছি।

এখন মনে করিলে হাসি পায়, দিনের পর দিন চিঠি ডেলিভারির

সময় নিকট হইলে, ক্রমাগত ঘড়ির কাঁটা এবং পথের পিয়নের দিকে নির্ণিমেষ চোখে চাহিয়া থাকিতাম। বৈকালে চিঠি ডাকে দিতে পাছে বিলম্ব হয়, এই ভয়ে ক্রমাগত ঘড়ির দিকে চাহিয়া সময় কাটাইয়াছি। প্রতি শনিবার বৈকালে ট্রেন ফেল করিবার আশঙ্কায় হাতের কব্জির দিকে চাহিয়াছি, আর ট্রাম বাস ধরিতে ছুটিয়াছি। ট্রেনে উঠিবার পূর্বে যে ঘড়িব কাঁটা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চলিতেছিল, ট্রেনে উঠিয়া মনে হইত, ঘড়ির কাঁটা যেন অত্যন্ত আস্তে আস্তে চলিতেছে।

নিজের বাড়িতে এবং অন্যান্য প্রতিবেশীর বাড়িতে সন্তানাদি হইবার সময়ে আমার ওই ঘড়িটা কত কাজে লাগিয়াছে। জন্মের সময় ঠিকমত নির্ধারণ করিতে আমার ওত উৎকৃষ্ট ঘড়িটি কতজনে আদর করিয়া চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। আবার মৃত্যুর সময় নির্ণয় করিতেও বহুবার আমার ঘড়িটি বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। দুইটি বা ততোধিক ঘড়ির সময়ের অমিল হইলে অনেক সময়ে আমার ঘড়িটিই সগর্বে জয়লাভ করিয়াছে।

বাড়িতে কারো অসুখ হইলে আমার ঘড়িটি হাতে বাঁধিয়া রোগীর পাল্‌স্‌ গণিয়াছি, থারমোমিটার দিয়া তাপ দেখিয়াছি। ডাক্তারের ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা ঘড়ি দেখিয়াই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছে।

এই দীর্ঘ তের বৎসরের মধ্যে কতবার ষ্ট্র্যাপ বদলাইয়াছি। কালো, ব্রাউন, চকলেট কত প্রকার চামড়ার ষ্ট্র্যাপ, আবার সাদা কালো কাপড়ের ষ্ট্র্যাপ ওই ঘড়িটাকে পরাইয়াছি, কত পছন্দ করিয়া, কত যত্ন করিয়া। কতবার দোকানে দিয়াছি অয়েল করিতে এবং অস্থির উদ্বিগ্ন মনে উহার প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া দিন কাটাইয়াছি। পুরাতন বিশ্বস্ত চাকরের অসুখ হইলে মনের যে অবস্থা হয়, দোকান-শায়ী ঘড়ির অনুপস্থিতিতেও তেমনি অস্বস্তিবোধ করিয়াছি।

যাত্রার সময় স্থির করিতে, বিবাহের লগ্ন নির্ণয় করিতে, আরতির সময় স্থির করিতে, সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি করিতে আমার ওই ছোট্ট বন্ধুটির মুখের দিকে বহুবার চাহিয়া চাহিয়া অনুমতি লইতে হইয়াছে। মাসিমার গঙ্গাস্নানের সময়, পিসিমার অম্বুবাচী নিবৃত্তির সময়, জ্যেঠাইমার গ্রহণ-স্নানের সময় ঠিক করিয়াছি আমার ওই ঘড়ির কাঁটা দিয়াই।

কতবার কত স্পোর্টসের সময়ে দৌড় লাফ প্রভৃতির নির্দিষ্ট সময় স্থির করিয়াছি আমার ঘড়িটির দিকে চাহিয়া। কতবার কত রেফারি আমার ঘড়িটি হাতে বাঁধিয়াই বিভিন্ন দলের ভাগ্য-বিচার করিয়াছে। কতদিন খেলার মাঠে স্বকীয় দলের হার-জিতের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত মনে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চাহিয়াছি। সিনেমা বা থিয়েটার দেখিতে গিয়া কতবার ঘড়ির দিকে চাহিয়াছি, সমাপ্তির আশায় বা আশঙ্কায়। গাড়ী চালাবার সময়ে কতবার ঘড়ি দেখিয়াছি, গাড়ীর বেগ নির্ণয় করিতে অথবা পথের দৈর্ঘ্য মাপিতে।

কয়েক বৎসর পূর্বের কথা। একবার গয়া ষ্টেশনে নামিয়া দেখি, মণিব্যাগটি অন্তর্হিত হইয়াছে। আমার ওই সোনার ঘড়িটি ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। আমার এই বন্ধুটি আজ এই বিপদের দিনে আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে!

দীর্ঘ তের বৎসর যাবৎ ওই ঘড়িটি আমার পরম আত্মীয়ের মত সুখে দুঃখে আমার জীবনের সঙ্গে মিশিয়া ছিল। কত সময় কত কষ্ট পাইয়াছে সে, তবু আমায় পরিত্যাগ করে নি। ঘামে ভিজিয়াছে, রৌদ্রে পুড়িয়াছে, বাতাসে কাঁপিয়াছে, বাসে, ট্রামে, গাড়ীতে, ট্রেনে কত ঝাঁকুনি সহিয়াছে, পড়িয়া গিয়া কাঁচ ভাঙিয়াছে, সোনার ডালায় টোল খাইয়াছে, দম অভাবে নিস্পন্দ হইয়াছে, ছেলেমেয়ের দৌরাত্ম্য

সহিয়াছে, কিন্তু তবু সে আমারই হাতে একান্ত নির্ভয়ে নিজেকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

আমার এই পুরাতন বন্ধুটির অভাব আজ সারাদিন অনুভব করিয়াছি। এখনও বসিয়া বসিয়া তাহারই কথা ভাবিতেছি। রাত্রি কত হইল? কেমন করিয়া বলিব? হাতের কব্জিতে ষ্ট্র্যাপের দাগটি এখনও রহিয়াছে, কিন্তু কিছুই টিক্‌টিক্ করিতেছে না। ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। চারিদিক প্রায় নিস্তব্ধ। আমার ঘড়িটির শোকে মুহ্যমান হইয়া তন্দ্রা আসিবার উপক্রম হইয়াছে। হঠাৎ, ও কি! একটি তরুণীর করুণ আর্তনাদ না? উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম।

এ অঞ্চলটায় প্রায় সকলেই ইভ্যাকুয়ী। আমার বাসার পাশেই আর একটি ইভ্যাকুয়ী পরিবার আসিয়াছেন। শুনিয়াছিলাম, ইঁহারা বর্মা হইতে আসিয়াছেন। নানা ঝঞ্ঝাটে ওই বাড়িতে গিয়া অন্য কোন সংবাদাদি লইতে পারি নাই। নূতন সংগৃহীত চাকরটাকে ডাকিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ও বাড়িতে কাঁদে কে?' এমন সময় পুনরায় আর্তনাদ শুনিলাম, 'ওরে আমার বাছারে, আমার সোনারে, তুই কোথায় আছিস রে'—ইত্যাদি। চাকরটি জানাইল, বর্মা হইতে আসিবার পথে উহার একমাত্র সন্তান, একটি শিশুপুত্র হারাইয়া গিয়াছে।

অবসন্ন শরীর মন আরো অবসন্ন হইয়া পড়িল। কোনমতে শরীরটাকে টানিয়া লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। ঘড়ির শোক ভুলিয়াছি। মেয়েটির আর্তনাদ এখনও কানে আসিতেছে।

জুন, ১৯৪২

কলাবতীর উপাখ্যান

বঙ্গদেশের কলিকাতা নগরীতে লেক প্লেস নামক রাজপথ-পার্শ্বে গদাধর সামন্ত বাস করিতেন। গদাধর বাবু ধনী বণিক। বিবিধ প্রকার ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া বহু অর্থ উপার্জন করিতেন। গদাধর বাবুর একটি প্রধান গুণ ছিল এই যে, তিনি অতীব কলা-রসিক ছিলেন। শুধু অবসর বিনোদনের জন্য নানাপ্রকার নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থা করিয়াই যে তিনি তৃপ্ত থাকিতেন তাহা নহে, সঙ্গীত, যন্ত্র-সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফি, সূচীশিল্প, বিবিধ প্রকার কারুকার্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার প্রকৃত অনুরাগ ছিল। এই সকল বিষয়ের অনুশীলন এবং প্রচারের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। এই কলা-প্রিয়তার জন্য গদাধর বাবুর নাম সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিল।

গদাধর বাবুর তিন পুত্র, এক কন্যা। পুত্র তিনটিই কৃতী, সকলেই পিতার ব্যবসায়ের অংশ তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই চলিয়াছিল। কন্যাটি কনিষ্ঠ সন্তান। গদাধর বাবু আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন কলাবতী। নিজের রুচি এবং আদর্শানুযায়ী উহাকে সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার সহিত বিবিধ প্রকার শিল্পকলায় পারদর্শিনী করিয়া তুলিলেন। বিশেষ করিয়া নৃত্য ও গীতে তাহার পারদর্শিতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এবং ক্রমশঃ বহু স্থানে বহু প্রশংসা অর্জন করিল। কলানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবিধ শাখার সহিত কলাবতীর পরিচয় হইল। দুই জন নিষ্ঠাবান সুপণ্ডিত শিক্ষকের নিকট ভারতের এবং পাশ্চাত্ত্য দেশের দর্শন, ধর্ম ও সংস্কৃতির

বিশেষত্ব সযত্নে শিক্ষা করিল। এইরূপে লালিত ও পালিত হইয়া কলাবতী এক দিকে যেমন অসামান্য রূপলাবণ্য ও নৃত্যগীতকুশলতা লাভ করিল, তেমনি বিবিধ প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার মন-পঙ্কজ অপূর্ব শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিল।

বাংলার সমাজে যুবতী কলাবতী অতীব পরিচিতা হইয়া উঠিল। সর্বপ্রকার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে তাহার নিমন্ত্রণ এক প্রকার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। কলাবতী ব্যতীত কোন শিল্পীই যেন তাহার স্থান পূরণ করিতে পারে না। কোন অনুষ্ঠানে কলাবতী উপস্থিত হইলেই সেখানে একটা নূতন উন্মাদনা, একটা অভিনব আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়। কন্যার কৃতিত্বে ও যশের সৌরভে পিতা গদাধর আনন্দে ও গৌরবে আত্মহারা হন।

কলাবতীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণায় গড়িয়া উঠিল বহু স্থায়ী ও অস্থায়ী সভা, সমিতি, সঙ্ঘ ও সম্মিলন। বহু শিল্প-বিদ্যালয় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিবিধ প্রকারে কলাবতীর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ধন্য হইল। প্রায় প্রত্যহই নানা স্থান হইতে কলাবতীর সাদর নিমন্ত্রণ, সানুনয় আহ্বান, আন্তরিক অপ্যায়ন এবং অযাচিত সম্মান ও প্রশংসা আসে। সাধ্যমত অনুরোধ রক্ষিত হয়, আবার মাঝে মাঝে সবিনয় প্রত্যাখ্যানও করিতে হয়। তরুণ ও তরুণী সমাজে কলাবতীর নাম একটি মোহন মন্ত্রের মত হইয়া উঠিল।

কলাবতীর বয়স যখন আঠার, তখন তাহার মাতা ঠাকুরাণী পরলোক গমন করেন। কলাবতী যে শুধু একটি স্নেহময়ী জননীকেই হারাইল তাহা নহে, তাহার শিল্পী-জীবনের প্রধান সহায় ও অভিভাবককেও হারাইল। কলাবতীর প্রতি প্রচেষ্টায়, প্রতি সাধনায় তাহার মমতাময়ী মাতা ঠাকুরাণী অকুণ্ঠ ভাবে সহায়তা করিতেন। তাহার বেশ-ভূষা,

তাহার আহারাদি, তাহার সময়োপযোগী আনন্দবিধান, তাহার স্বভাব ও চরিত্র প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন। ইঁহার মৃত্যুর পর কলাবতী সহসা যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিতে লাগিল। পিতা সর্বদাই বহু কার্যে বিব্রত থাকিতেন। এখন হইতে কলাবতীকে নিজেই নিজের সমস্ত ভার লইতে হইল। তাহার ভ্রাতারা বড় হইয়াছে। তাহাদের নিজেদের সংসার হইয়াছে। কলাবতীর প্রতি সাধারণ কর্তব্য পালন ব্যতীত তাহারা আর কিছুই করিতে চাহে না। কলাবতীর জীবনের সহিত তাহাদের জীবনের কোথাও যেন ঐক্য নাই।

কলাবতীর বয়স যখন কুড়ি, তখন গদাধর বাবু উহার বিবাহের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন সর্বগুণসম্পন্না রূপসী কন্যার উপযুক্ত পাত্র সহজে পাওয়া যায় না। গদাধর বাবু প্রাণ দিয়া কলাবতীকে মানুষ করিয়াছেন, নিজের উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছেন। অনুপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিতে তাঁহার মন অগ্রসর হয় না। তাঁহার এবং তাঁহার কন্যার কল্পনা, আদর্শবাদ, শিল্প-প্রীতি প্রভৃতিকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করিবে, বিবাহিত হইলেও তাঁহার কন্যাকে তাহার স্বকীয় জীবন বিকশিত করিতে সহায়তা করিবে, এমন ঘর এমন পাত্র পাওয়া অতীব কঠিন। গদাধর বাবু বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মনের মত পাত্র পাইলেন না।

এদিকে মাতৃহীনা এবং বয়ঃপ্রাপ্তা কলাবতী অনেকখানি স্বাতন্ত্র্যের অধিকারিণী হইয়া স্বভাবতই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। পিতামাতার স্নেহ ও কঠিন শাসনে যে চরিত্রের দৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ অটুট থাকিলেও বাহিরের ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অস্থৈর্যের লক্ষণ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইল। গদাধর বাবু ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং একটি

সুপাত্রের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু নিয়তির গতি বোধ করিবে কে? একদিন সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গদাধর বাবুর জীবনদীপ নির্বাপিত হইল এবং এই মুহূর্ত হইতেই কলাবতীর জীবনেও হতাশার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

কলাবতী বুদ্ধিমতী। নূতন পরিস্থিতিতে একেবারে আত্মহারা হইয়া ভাঙিয়া পড়িল না। ভ্রাতাদেব সংসারেই সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বাস করিতে লাগিল। ভ্রাতারা তাহাকে নানা ভাবে সাহায্য করিলেও তাহার শিল্পী-জীবনকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে কোন দিনই পারে নাই, এখনও পারিল না। ক্রমশঃ কলাবতী সম্পূর্ণ একাকিনী হইয়া পড়িল।

বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহাব স্বভাবিক পরিচয় ঘটিয়াছিল। সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া কলাবতী কিছু-কিছু উপার্জনও করিতে লাগিল। তাহার অসামান্য শিল্প-প্রতিভা বাংলার বাহিরেও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাহাকে বাংলার বাহিরের কোন কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানেব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইত। এইরূপে তাহার ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিচয় ও খ্যাতি লাভের ফলে বহু পদস্থ ব্যক্তির সহিত আলাপ হইল। কেহ কেহ কার্যব্যপদেশে বা ভ্রমণোপলক্ষে কলিকাতায় আসিলে কলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, কোথাও কলাবতীর নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থা হইয়াছে সংবাদ পাইলে তথায় গিয়া তাহার অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। বাংলার এই রত্নটির সহিত পরিচিত হইয়া বহু দেশের বহু ব্যক্তি নিজেকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে কলাবতী বিশ্রাম করিতেছিল তাহার নিজের ঘরে। দরজার পর্দার ফাঁক দিয়া বাহিরে বৌদিদিদের সাড়া পাইয়া কলাবতী উঠিয়া আসিয়া বলিল, এই যে, আপনারা, আসুন, আসুন!

ঘরের মধ্যে দুইখানি সোফা ছিল, তাহাতে দুই বৌদিদি বসিলেন, ছোট বৌদিদি বসিলেন খাটের উপর এবং কলাবতী একটি মোড়া টানিয়া লইয়া তাহাতেই বসিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে বৌদিদিদের দিকে চাহিল। তাঁহাদের মুখ দেখিয়া কলাবতী একটা ঘনায়মান দুর্যোগের আভাস পাইয়া অন্তরে অন্তরে ভীত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ সকলেই নীরব রহিলেন। পরে তিন জনের প্রতিনিধিরূপে বড় বৌদি কথা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, এখন আবার কেউ এখানে এসে পড়বে না তো? দিবারাত্রই তো লোক আসা-যাওয়া করছে।

কলাবতী বলিল, না, কারো আসবার কথা নেই তো। তা ছাড়া কেই বা আসে? কখনো কোন সভা-সমিতি থেকে নিমন্ত্রণ করতে আসে। তা এমন দুপুর বেলায় কে আসবে?

কি জানি বাপু! তোমার দাদারা তো অত্যন্ত ভীত আর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

কেন?

কেন, সেটা বোঝবার বয়স তোমার হয়েছে। যাই হোক, এ নিয়ে আর বেশি কথা বাড়াতে চাই নে।

আপনারা কি বলতে চাইছেন, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি নে।

মানে, তোমার দাদারা বলছেন, তোমার এ ভাবে এ-বাড়ীতে থাকাটা—

দাদারা এই কথা বলছেন?

বড় বৌদি অন্য দুই বৌদিদির দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, তাঁরাই তো বলছেন। আমরা কেন বলতে যাব?

দাদারা কি বলছেন?

বলছেন, তোমার চাল-চলন ক্রমেই অশোভনীয় হয়ে উঠছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, তাদের সামনে এ সব উদাহরণ—

কি সব উদাহরণ ?

এই সব, নাচ, গান, সভা, সমিতি, দেশ-বিদেশ বেড়ান, এই সব। তা ছাড়া নানা রকম লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়।

বৌদি, এতদিন একত্র বাস করেও, আমাকে এত দিন ধরে এত ভালবেসেও, আপনারা এইটুকু সহতে পারছেন না ? আমি যে আপনাদেরই ছোট বোন বৌদি !

কিন্তু উপায় নেই। আমরা নিরুপায় হয়েই তোমার কাছে এ সব কথা বলতে এসেছি। আমাদের একত্র থাকা সম্ভব নয়।

আমি তো দূরেই রয়েছি। শুধু একসঙ্গে বসে খাই, তা ছাড়া আর কোন সম্পর্ক তো আপনারা রাখেন নি। বাবা মা কেউ নেই বলেই, এটুকু সান্নিধ্যও তোমাদের একেবারেই অসহ্য হয়ে উঠেছে ?

আমরা জানি, তুমি খুব আঘাত পাবে, কিন্তু উপায় নেই। এখানে থাকা তোমার হবে না।

মেজদারও কি এই মত ?

মেজ বৌদি মাথা নীচু করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আমরা সবার মত নিয়েই তোমার কাছে এসেছি।

ছোটদারও এই মত ?

ছোট বৌদি হাতের নথ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিলেন, হ্যাঁ, আমরা সবার মত নিয়েই তোমার কাছে এসেছি।

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। পরে বড় বৌদি বলিলেন, দেখ, এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই।

না, কথা আমি আর বাড়াতে চাই নে। আমি কোথায় যাবো সে-সম্বন্ধে দাদারা কিছু বলেছেন ?

না, তা তো বলেননি ?

তবে ?

বড় বৌদি অপর দুই বৌদির মুখের দিকে চাহিলেন এবং বলিলেন, তোমার তো বন্ধু-বান্ধব অনেক আছেন !

ছোট বোন, কুমারী মেয়ে, বন্ধু-বান্ধবের কাছে গিয়ে থাকবে, এইটেই কি দাদাদের মত ?

ঠিক তেমন কিছু বলেননি। তবে আমরা বলছি।

কলাবতীর মন আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে। এই দাদারা তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে। কথায় আছে, ভ্রাতা-ভগিনীর স্নেহই সর্বাপেক্ষা নির্মল, নিঃস্বার্থ স্নেহ। অথচ কলাবতীর ললাটের লিখন এমনই যে, তিনটি ভ্রাতা থাকিতেও সে শুধু অসহায় নয়, নিশ্চিত বিপদের করাল গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে এই ভ্রাতাদের নিষ্করুণ মনে কোন দ্বিধা নাই। আর এই তিনটি নারী। ইহাদেরও কি এতটুকু প্রাণ, এতটুকু মমতা নাই ?

সকলেই আবার নীরব হইলেন। কলাবতীর চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা অশ্রু জমিয়া উঠিল ! এই অশ্রুই কি তাহার জীবনের চিরসঙ্গী হইবে ? একটু পরে কলাবতী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কেহই কোন কথা বলিলেন না। কোন বৌদির নিকট হইতেই কোন সান্ত্বনার বাণী আসিল না। নিস্তব্ধ ঘরে শুধু একটি ঘড়ির টিক-টিক শব্দ কলাবতীর অসহ বেদনায় সহানুভূতি জানাইল। কিছুক্ষণ পরে বড় বৌদিদি বলিলেন, আমরা এখন আসি। শীগ্‌গিরই মানে, দুই-এক দিনের মধ্যেই যা হোক একটা ব্যবস্থা করো।

কলাবতী দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বৌদিদিরা ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

তিন

কলাবতী উঠিয়া বসিল। চোখ মুছিয়া কঠিন হইয়া তাহার বিছানার 'পরে একটু শুইয়া রহিল। তার পর উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া আয়নার সামনে গিয়া চুলটা সাড়ীটা একটু ঠিক করিয়া লইল। মনে মনে বলিল, দুই-এক দিনের মধ্যে নয়, আজই, এখনই যাবো এ-বাড়ী ছেড়ে। তাহার আলমারিতে ও বাক্সে কাপড়-জামা ও গহনা যাহা কিছু ছিল, সব মেঝের উপর ছড়াইয়া ফেলিল এবং তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি একটি বড় সুটকেশে ভর্তি করিল। একটি ছোট বাক্সে গহনাগুলি রাখিয়া সেটাকে সযত্নে সুটকেশের একপাশে রাখিল। সামান্য কয়েকখানি বাসনও তাহাতে পুরিয়া লইয়া আর সব ছড়ানো জিনিষগুলি পা দিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সুটকেসটির উপর বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তার আর অভাব কি? এখান হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইবে সে? কিন্তু সে কথা পরে। এ স্থান এখনই ছাড়িতে হইবে এইটাই এখনকার বড় কথা।

কলাবতী উঠিয়া গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। একটি ঝাঁকামুটে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল। বলিল, ঘরের এই সব ছড়ানো জিনিষগুলো তোর ঝাঁকায় তোল।

মুটে আজ্ঞা পালন করিল। কলাবতী বলিল, এগুলো আমি তোকে দিলাম। যা, নিয়ে তোর বাসায় রেখে আয়, তার পরে যাবি আমার সঙ্গে।

এ সব নিয়ে রাস্তায় বেরুলেই লোকে আমাকে ধরে থানায় নিয়ে যাবে।

কোন ভয় নেই। এই নে, এই সুজনীটা ঢাকা দিয়ে নিয়ে যা। কেউ কিছু বললে তাকে নিয়ে আমার কাছে চলে আসিস।

বিস্মিত মুটে অপ্রত্যাশিত দান লইয়া চলিয়া গেল। পাছে কোন গোলমালে পড়ে এই ভয়ে সে আর ফিরিয়া আসিল না।

কলাবতী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আর একটি মুটের মাথায় সুটকেশটি চাপাইয়া ব্যাগ আর ছাতা হাতে করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

লেক প্লেস হইতে বাহির হইয়া সোজা সাদার্ন এভেনিউতে গিয়া পড়িল এবং মাঝখানের ঘাসের উপর দিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কলাবতীর সহসা মনে পড়িল, সাদার্ন এভেনিউএর বিখ্যাত জমিদার মহেন্দ্র চক্রবর্তীর কথা। বহু দিন পূর্বে সে একবার গিয়াছিল উঁহার বাড়ীতে একটি বড় গানের জলসায়। সে শুনিয়াছিল, মহেন্দ্র বাবু যেমন ধনী, তেমনি উদার-প্রকৃতি। তিনি নিয়মিত ভাবে অনেকগুলি বিদ্যালয়, কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয়, সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতিতে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। মহেন্দ্র বাবুর কাছে গেলে এই বিপদে হয়তো একটা আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে, এই আশা লইয়া কলাবতী মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

কলাবতী যখন গাড়ী-বারান্দার নীচে সামনের সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল,

তখন মহেন্দ্র বাবু নীচেই বসিবার ঘরে ছিলেন। কলাবতীকে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া আসিলেন এবং বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি, এ সময়ে কি মনে করে? আসুন, আসুন! এই কথা বলিতে বলিতে কলাবতীকে লইয়া পাশের একটি ঘরে বসাইলেন। মুটে সুটকেশ রাখিয়া কলাবতীর নিকট হইতে পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, তার পর, কেমন আছেন, ভাল আছেন তো?

কলাবতী কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, একটু বিশেষ বিপদে পড়েই এখানে এসেছি। সবই বলছি। একটু জল আনিয়ে দেবেন? গলাটা শুকিয়ে গেছে।

মহেন্দ্র বাবু চাকরকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, শীগ্‌গির এক কাপ চা করে নিয়ে আয় আর সঙ্গে কিছু খাবার। কলাবতীকে বলিলেন, আপনি চা খেয়ে একটু বিশ্রাম করুন। আমি একটু পরে আসছি।

চা-পানের পর মহেন্দ্র বাবু আসিলেন। বলিলেন, কি ব্যাপার বলুন তো?

কলাবতী সমস্ত ব্যাপারটি মহেন্দ্র বাবুকে জানাইল। কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সব শুনিয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, স্থায়ী ভাবে এখানে থাকা অবশ্য সম্ভব নয়, সেটা আপনিও বোঝেন! তবে আপাতত এইখানেই থাকুন। আর আপনি চেষ্টা করুন, আমিও চেষ্টা করি, একটা ভাল ব্যবস্থা হয়েই যাবে। আপনি অস্থির হবেন না।

কলাবতী বলিল, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো, জানি নে। এমন একটা বিপদে আপনি আমাকে রক্ষা করলেন, এ জন্য আপনার কাছে আমি চিরঋণী থাকবো।

কলাবতী আপাতত মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে রহিল। নীচের তলায় একখানি ঘর। অল্প অথচ রুচিসম্মত আসবাব। সঙ্গীত-বিষয়ক যে

যন্ত্রগুলি সে দাদাদের বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছিল, সেগুলি লোক পাঠাইয়া আনাইয়া লইল। কলাবতী অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিল। নিয়মিতরূপে সে তাহার শিল্প ও সঙ্গীতের সাধনা করে। মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে নিমন্ত্রিত হইয়া তাহার অপূর্ব গীত, নৃত্য প্রভৃতি দ্বারা সকলকে মোহিত করে। কখনও কিছু উপার্জন হয়, কখনও শুধু প্রসংসা ও ফুলের মালা লইয়াই তৃপ্ত হয। নিউ এম্পায়ারে, ইউনিভারসিটি ইন্ষ্টিটিউটে, থিয়েটারের ষ্টেজে এবং বড় বড় মজলিসে সর্বদাই তাহার নিমন্ত্রণ হয়। কলা-চর্চার ফাঁকে ফাঁকে কলাবতী ধর্ম সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী প্রভৃতি বিষয়ে বই পড়ে। পিতার নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহা তাহার জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

চার

কলাবতীর এই স্বচ্ছন্দ জীবন বেশিদিন বিধাতা সহিতে পারিলেন না। ঝড় আসিল মহেন্দ্র বাবুর অন্তঃপুর হইতে। একদিন মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী স্বামীকে স্পষ্টই বলিলেন, কলাবতীর এ বাড়ীতে আর থাকা হবে না।

কেন ?

ভাল দেখায় না।

কোথায় যাবে ও ?

সে জন্য তোমার মাথাব্যথা কেন ?

মাথাব্যথা ঠিক নয়, কিন্তু অসহায় একটা লোকের প্রতি কর্তব্য কি নেই ?

কর্তব্য তো করেছ। আব নয়।

কিন্তু কোথায যাবে ও ? ওর আয় এমন নয়, যাতে স্বাবলম্বী হয়ে একটা বাসা ভাড়া করে থাকতে পাবে। অথচ এমন একটা শিল্পী, এমন একটা প্রতিভা, এমন একটা সংস্কৃতিবান্ প্রাণ, একে তো পথে বের কবে দেওয়া যায না ?

তুমিই একটা ব্যবস্থা করে দাও, কিন্তু অন্যত্র।

সে তো অনেক খবচ। একটা মাত্র মানুষের জন্য একটা ছোট বাড়ী, লোক-জন—সে তো অনেক খরচ।

কি আব এমন খরচ। কত স্কুলে, কত কলেজে, কত হাসপাতালে, অনেক টাকা তো দিচ্ছ। এটাও তেমনি—

শুধু একটা লোকের জন্য এত খবচ ?

তুমিই তো বললে, এমন প্রতিভা, এমন অসামান্য শিল্পজ্ঞান, এব জন্য না হয হ'লই বা কিছু খরচ ! ও তো শুধু একটা মেয়ে নয, ও যে যে বাংলার একটা রত্ন, একটা অসামান্য গৌবব।

সে তো জানি। আমার বাড়ীতে আমাব তত্ত্বাবধানে থাকলে আমি ওর জন্য খবচপত্র করতে কুণ্ঠিত নই। কিন্তু ওর জন্য স্বাধীন ভাবে থাকার ব্যবস্থা কবলে ও হয়তো কয়দিন পরে আব আমাকে গ্রাহ্যই করবে না। নানা প্রকার প্রলোভনের ভয়ও আছে।

তোমাকে গ্রাহ্য করা বা না-করাটা তো বড় কথা নয় ! ওর একটা ব্যক্তিত্ব আছে, স্বকীয়তা আছে, ঐশ্বর্য আছে, যার মূল্য তোমার তত্ত্বাবধানের চেয়ে ঢের বেশি। বাংলার দেবীমূর্তি ও। বাংলার জল, বাংলার মাটি, বাংলার বাতাস ওর প্রতি অণু-পরমাণু গড়ে তুলেছে। ওর ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা একান্ত ভাবে জড়িয়ে আছে বাংলার

সঙ্গে। ও স্বাধীন ভাবে যেখানেই থাকুক, বাংলার বাণীমূর্তিরূপে সর্বত্র আলো ছড়াবে।

এত যদি তোমার আগ্রহ, তবে এখানে থাকতে এত আপত্তি কেন ?

এখানে থাকা হতে পারে না।

দেখা যাক, কি করতে পারি।

এদিকে কলাবতীর স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে অবস্থান ব্যাপারটা তাহার পরিচিত, অপরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এবং সভা, সমিতি ও মজলিসে আলোচিত হইতেছে। অনেকেই উহার জন্য একটা উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু কার্যত তাঁহারা কেহই কিছু করিতেছেন না।

কিছু দিন পরে যখন মহেন্দ্র বাবুর বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন এই সকল আলোচনা আরও ব্যাপক ভাবে চলিতে লাগিল। বিশেষত তরুণ ও তরুণী সমাজে একটা বিষম অলোড়ন উপস্থিত হইল। কিন্তু আলোচনা, সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক ব্যতীত আর কিছুই হইল না। কয়েক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি একবার মহেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎও করিলেন এবং তাঁহার বদান্যতার ভূয়সী প্রসংসা করিয়া কলাবতীর জন্য একটি সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। মহেন্দ্র বাবু তাঁহার স্ত্রীর সহিত আলোচনায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিলেন।

কলাবতীর এই অসহায় অবস্থার কথা ক্রমশঃ একটা সাধারণ আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র বাবু এক দিন নিজেই কলাবতীকে বিপদের কথাটা জানাইয়া দিলেন। কিছু দিন পূর্বে সে বৌদিদিদের

কাছে যে আঘাত পাইয়াছিল, এটা যেন তাহা অপেক্ষাও গুরুতর মনে হইল। কলাবতী মনেও করিতে পারে নাই, মহেন্দ্র বাবুর মত এক জন ধনী, গুণী এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি তাহাকে পথে বসাইবার প্রস্তাব করিতে পারেন। এ আঘাত তাহার কাছে অসহনীয় মনে হইল। মহেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাতের পর প্রায় পনের দিন সে বাড়ীর বাহির হইল না বা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না।

প্রতিবেশীরা এবং গুণানুরাগীরা নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। কলাবতীর একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকগুলি ছোট ছোট সভাও অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই হইল না। আগ্রহ অনেকেরই আছে, কিন্তু কাহারও সংকল্পের গভীরতা নাই। বৃদ্ধেরা বলিতে লাগিলেন, মেয়েটার একটা হিল্লে হওয়া দরকার। এমন ভাবে চলিতে দেওয়া ঠিক নয়। যুবকেরা বলিল, এর একটা বিহিত করিবার মূল উপাদান কাহারও কাছে নাই। তরুণীরা সমবেদনায় ব্যাকুল, আলোচনায় মুখর, কিন্তু প্রতিকারে অক্ষম।

নিজের অসহায় অবস্থা ও অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতে করিতে এবং ক্রমশঃ নানা দিক হইতে নানা প্রকার হিতোপদেশ ও আলোচনা শুনিতে শুনিতে কলাবতীর মন ক্রমশঃ ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। এক-এক সময়ে তাহার মনে হইত, সে বুঝি পাগল হইয়া যাইবে। কি অপরাধ সে করিয়াছে? সে প্রাণপণে বাংলাকে, বাংলার আকাশ-বাতাসকে ভালবাসিয়াছে, বাংলার প্রতিভাকে নিজের জীবনে বিকশিত করিয়াছে, বাংলার শিল্পকে, বাংলার কলাকে অদ্ভুত প্রাণবান্ রূপ দিয়াছে, মানুষের মনে আনন্দের ধারা বর্ষণ করিয়াছে। তবু বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারটাও সে পাইবে না? কলাবতীর মন যেন মরিয়া হইয়া উঠিল। যে সকল প্রতিষ্ঠান, সমিতি প্রভৃতি হইতে সে

নিমন্ত্রণ পাইত, লজ্জা ও সম্মানের মাথা খাইয়া সে প্রায় প্রত্যক্ষ ভাবেই তাহাদিগকে তাহার অসহায়তার কথা জানাইল। কিন্তু মৌখিক সহানুভূতি ব্যতীত আর কিছুই তাহার ভাগ্যে জুটিল না। এক দিন সন্ধ্যার পরে মহেন্দ্র বাবু তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, তাহার এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার। কলাবতী অনেক ভাবিল, কিন্তু ভাবনার শেষ হইল না। সকালে ভাবিল, দুপুরে ভাবিল, সন্ধ্যায় ভাবিল, রাত্রে ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিন্তা করিবার শক্তিও যেন লোপ পাইল। অবশেষে স্থির করিল, সে নিজেকে পৃথিবীর বুক হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবে। ইহাই একমাত্র পথ। সে মহেন্দ্র বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, আমি স্থির করেছি, তিন দিনের মধ্যেই আমি এখান থেকে চলে যাব।

কোথায় যাবে ?

তা জেনে আপনার কি লাভ ? আপনি আমার বিপদের সময়ে যে উপকার করেছেন, সে জন্য ধন্যবাদ। আচ্ছা, নমস্কার।

কলাবতী আজ খুব সকালে উঠিয়াছে। ঘরের জিনিষপত্র সব গুছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার সংকল্প দৃঢ় হইয়াছে। আজ সে এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইবে। যাইবার পূর্বে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার জন্যই যেন সে নামিয়া আসিল সাদার্ন এভেনিউতে। কত লোক যাইতেছে, সকলেই তাহার চেয়ে সুখী। বেশ তো ! কত গাড়ী যাইতেছে, গাড়ীতে কত নর-নারী, কত যুবক-যুবতী, কত শিশু, হাসিতেছে, খেলিতেছে। ইহারা সকলেই থাকিবে, শুধু সে চলিয়া যাইবে। পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে তো তাহার কোন কষ্ট নাই ! কিন্তু এই বাংলা দেশকেও যে ছাড়িতে হইবে ! তাহার প্রাণটা যে ওখানেই টন-টন করিয়া ওঠে। সাদার্ন এভেনিউএর মাঝখান দিয়া কলাবতী

পাদচারণা করিতে লাগিল, পূব হইতে পশ্চিমে, পশ্চিম হইতে পূবে কিন্তু বেশি দূরে সে গেল না, বেশি হাঁটিবার উৎসাহ তাহার নাই। এই তাহার শেষ ভ্রমণ। এই দিন আর ফিরিয়া আসিবে না তাহার জীবনে।

অনেকক্ষণ এইরূপ ভ্রমণ করিয়া কলাবতী বাড়ীতে ফিরিল। ফিরিয়া দেখিল, তাহার বিছানার উপরে একখানি চিঠি পড়িয়া আছে। একটু ব্যস্ততার সঙ্গেই চিঠিখানি খুলিয়া এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। চিঠি আসিয়াছে দিল্লী হইতে। লেখকের নাম ভকতরাম। চিঠির মর্মার্থ এই আমার এক বাঙালী বন্ধুর নিকট জানিতে পারিলাম, আপনি বাসস্থানের অভাবে বিপদে পড়িয়াছেন। আপনার নাম ও গুণাবলী এ-অঞ্চলেও সুপরিচিত। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার আশ্রয়ে বাস করিতে পারেন। আমি আপনাকে বৎসরে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দিতে সম্মত আছি। পত্র পড়িয়া কলাবতী বিছানায় শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। বিধাতার এ কি পরিহাস! কলাবতী দিল্লীওয়ালার রক্ষিতা হইবে? মনে করিয়াই মনে মনে যেন হাসিয়া ফেলিল। কি আশ্চর্য! বাংলা দেশের কেহ তো তাহাকে এমন পত্র লিখিল না? কিন্তু এ হয় না। কলাবতী দিল্লীওয়ালী হইতে পারে না। সে যে সংকল্প করিয়াছে, তাহাই ঠিক। বাংলা দেশ পরিত্যাগ করা আর পৃথিবী পরিত্যাগ করা একই কথা।

আহারাদির পর দুপুরে শুইয়া শুইয়া পত্রখানি হাতে লইয়া বার বার পড়িল। চিন্তার পর চিন্তা। অনেকক্ষণ পরে একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। দিল্লীর স্বপ্ন দেখিল। একবার নৃত্যপ্রদর্শনী উপলক্ষে দিল্লী গিয়া যে সব দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছিল, সেইগুলি মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেল। সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত। শরীরটা যেন কাঁপিতেছে। একটু স্থির হইয়া আবার চিঠিখানা হাতে

লইয়া পড়িল। তার পরে চিঠিখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া একটি চেয়ারে শরীর এলাইয়া দিয়া আবার যেন কি ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটু হাসিয়া আবাব বিছানায় শুইয়া পড়িল।

বৈকালের দিকে একবাব বাহির হইয়া নিকটবর্তী পোষ্ট অফিসে গিয়া ভকতরামের নামে টেলিগ্রাম করিল, আমি সম্মত। আজই রওয়ানা হইতেছি। বাড়ী ফিরিযা গুছানো জিনিষ-পত্রগুলি আবার ভাল কবিযা গুছাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্র বাবু একবার খোঁজ লইতে আসিযা দেখিলেন, কলাবতী প্রফুল্ল মনে জিনিষ-পত্র নাড়া-চাড়া করিতেছে। জিজ্ঞাসা কবিলেন, কিছু স্থির হ'ল ?

আপনাকে তো বলেছি, আজই সন্ধ্যার পরে এ বাড়ী ছেড়ে যাব।

কোথায় যাওয়া স্থির হ'ল ?

পরে জানতে পারবেন। সাড়ে সাতটার সময়ে দয়া করে একখানা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন।

ছয়

ট্রেন ছুটিযাছে। কলাবতীব মন দ্বিধায, সন্দেহে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায দুলিতেছে। গুন-গুন কবিয়া বিষাদ-ভবা সুরে একবার গাহিল—

আমার সোনাব বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,
চিবদিন তোমার আকাশ তোমাব বাতাস
আমাব প্রাণে বাজায বাঁশী।

কিন্তু এ বাঁশী তো আব বাজিবে না। কলাবতীব প্রাণের মূল উৎপাটিত হইযাছে। তাব গানের উৎসও বুঝি শুকাইয়া যাইবে। ভকতবাম কি বুঝিবে তাব প্রাণের ব্যথা? বোঝা কি সম্ভব? এ সব ভাবিয়া এখন কোন লাভ নাই। যে যাত্রা সুরু হইযাছে, তাহাব শেষ পর্য্যন্ত তো তাহাকে যাইতেই হইবে।

দিল্লীতে পৌছিয়া কলাবতী অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা লাভ করিল। স্বয়ং ভকতরাম ষ্টেশনে আসিয়া কলাবতীকে মহা সমাদবে গৃহে লইয়া গেল। উহাব সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা কবিয়া দেওয়া হইল।

এখানে আসিবার পব হইতেই নানা মজলিসে উহার নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। চারি দিকে কলাবতীর খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বাংলা দেশেও তাহার খ্যাতি পৌছিতে বিলম্ব হইল না।

বালীগঞ্জের প্রধানেরা মন্তব্য করিলেন, যাক, এত দিন পরে মেয়েটার একটা হিল্লে হ'ল।

বর্ষীয়সী মহিলারা বলিলেন, মরণ আর কি! বাংলা দেশ ছেড়ে, ছি, ছি!

তরুণ-তরুণীরা বলিলেন, এমন একটা প্রতিভাকে অনাদরে বাংলা দেশ ছেড়ে যেতে হ'লো? অহো, কি দুর্ভাগ্য! যাই হোক, ওখানে গিয়ে একটা বৃহত্তর সমাজে কলাবতী প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, এইটেই আমাদের গৌরব।

একটি ছোকরা বলিল, আর বলিস নে। বাংলার এমন একটা রত্নকে একটু ঠাঁই কেউ দিলে না। এখন বৃহত্তর প্রতিষ্ঠার বুলি কপচান হচ্ছে।

বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে যে সহস্র-সহস্র কলা কৃষ্টি-সম্পর্কিত সভা, সমিতি প্রভৃতির অধিবেশন হয়, তাহাতে উচ্চৈঃস্বরে কলাবতীর বিবিধ গুণের বিবিধ প্রশংসা করা হইল।

কয়েকটি সমিতি মিলিয়া কলাবতীকে একটি বিরাট অভিনন্দন দেওয়ার সংকল্প করিয়া তাহার নিকট পত্র লিখিল। পত্র পাঠ উত্তর আসিল, দুঃখিত। দারুণ অভিমানে কলাবতীর মন ভরিয়া রহিয়াছে। যে বাংলাকে সে অকপট ভাবে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, সেখানে আর সে কখনও ফিরিবে না। সে তো মরিতেই চাহিয়াছিল। বাংলা দেশ মনে করুক, কলাবতী মরিয়া গিয়াছে।

সাত

একটি কার্যোপলক্ষে মহেন্দ্র বাবু দিল্লী গিয়াছিলেন। সেখানে এক জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি মহেন্দ্র বাবুকে একখানি কার্ড দিয়া বলিলেন, অবশ্য যাবেন। একটা খুব উঁচু দরের মজলিস।

মহেন্দ্র বাবু যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই যিনি

গান ধরিলেন, তিনি কলাবতী। উহাকে দেখিয়া মহেন্দ্র বাবু আশ্চর্য হইয়া গেলেন। এই কি সেই কলাবতী! বসনে ভূষণে বাঙালীত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি তাহার মুখের সেই অপরূপ রমণীয়তা এখনও তাহাকে একান্ত ভাবেই বাঙালী করিয়া রাখিয়াছে। সে প্রথমেই গাহিল—

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

মহেন্দ্র বাবু জানিতে পারিলেন, কোন আসরে গেলেই কলাবতী না কি এই গানটি আগে গাহিয়া নেয়। দুই-এক বার বারণ করাও হইয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। আসর জমিয়া উঠিল। সমবেত দুবে, চৌবে, আয়ার, নাথন, কেশকার, পান্নিকর, জীবনরাম, গণেশলাল, রঙ্গমন, খাঁন প্রভৃতি 'বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা করিতে লাগিলেন। ইঁহারাই এখন কলাবতীর ভাগ্যনিয়ন্তা। ভকতরামের আশ্রয়ে এবং ইঁহাদের কারুণ্যে ও পোষকতায় কলাবতীর বৃহত্তর প্রতিষ্ঠা একটা বৃহত্তর, ব্যাপকতর এবং মিশ্রিততর খিচুড়ী-কৃষ্টির ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইয়াছে। কলাবতীর অন্তরের বাঙালী সত্তাটি শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আরো কিছু কাল পরে। মহেন্দ্র বাবু দিল্লী গিয়াছেন, কতকটা ভ্রমণও বটে, আবার কতকটা কাজও ছিল। এক দিন কুতব মিনারের পাশে গিয়া দেখিলেন, একটি পাগলী বসিয়া আছে। একটু কাছে যাইতেই চিনিতে পারিলেন, এ তো সেই কলাবতী! কি আশ্চর্য! কোথায় সে রূপ, সে বসন-ভূষণ, সে ঐশ্বর্য? মহেন্দ্র বাবু কি ভূত

দেখিলেন? কি ভয়ানক পরিণাম! পাগলী মহেন্দ্র বাবুকে বলিল, কি দেখছেন? বেশ হয়েছে, না? আমি আপনাকে চিনেছি। আপনি আমাকে বিপদে আশ্রয় দিয়েছিলেন, ধন্যবাদ! আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি—

মহেন্দ্র বাবুর চোখে জল আসিল। বলিলেন, ফিরে যাবে আমাদের কাছে? আর কখনো বলব না বাড়ী ছেড়ে যেতে।

কলাবতী হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, সে আর হয় না। টু লেট। কলাবতী মরে গেছে। বাংলা দেশ কলাবতীকে আর বাঁচাতে পারবে না।

মে, ১৯৫১

অফিসার

মহেশবাবু বড অফিসাব। কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বহুস্থানে ঘুরিয়াছেন এবং যেখানেই থাকেন, সেখানেই তাঁহাকে অধিকাংশ সময়ে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

পত্নী কণিকা দেবী ছায়াব মত পতির সঙ্গে সঙ্গে ঘোরেন। যখন যেখানেই থাকেন, তখন সেখানেই উহার সহিত যান। তাঁহার স্বামীর কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়, অসুখ বিসুখেব সময়ে শুশ্রূষার অভাব না হয়, ক্লান্ত অবসরে কথা বলিবাব লোকের অভাব না হয়, মনে কখনও অবসাদ বা বিষণ্ণতা না আসে, প্রভৃতি সব দিকেই কণিকা দেবী প্রখর এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

হয়তো কয়েকদিন উপর্যুপরি রাত্রি জাগরণের বা বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের ফলে মহেশবাবু ক্লান্ত ও অসুস্থ হইযা বাসায় ফিরিলেন। কণিকা দেবীব দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সীমা থাকে না। দিবারাত্র পাশে থাকিয়া, শুশ্রূষা করিয়া সান্ত্বনা দিয়া, স্বামীব পরিচর্যা করেন। তাঁহাকে সুস্থ ও সবল করিয়া তোলেন। কখনও কখনও স্বামীকে বলেন, কেন এত খেটে মরছ? কিছুদিন ছুটি নিলেই তো পার।

স্বামী বলেন, ছুটি তো ভাল, আমার মরবারও সময় নেই। তিন চারটে বড় বড় স্কীম অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। সমস্ত দিকটাই তো আমাকে দেখতে হচ্ছে।

তাই বলে শরীরটা এমন করে মাটি করবে?

কেন, তুমি তো রয়েছ। তুমি থাকতে আর আমার ভাবনা কি? আমার সব সুবিধে, অসুবিধে, সব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সব আনন্দ অবসরের ভার তো তুমিই নিয়েছ। আমার আর ভাবনা কি?

থাক, আর অত প্রশংসায় কাজ নেই। সব স্ত্রীই এমন করে থাকে। কিন্তু তাই বলে, সব চিন্তা, সব দায়িত্ব ভুলে কেবল চাকরির কাজ আর কাজ, এটাই কি জীবনের একমাত্র সার্থকতা?

জীবনের সার্থকতা কিসে জানিনে, তবে কর্তব্যপালনের একটা সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে।

তবু, এক এক সময়ে যেন আমার মনে হয়, তুমি ক্রমশ কলের মানুষ হয়ে যাচ্ছ।

হয়তো তোমার অনুমান সত্য। কিন্তু উপায় তো নেই।

উপায় নিশ্চয়ই আছে। চাকরির পথে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই খুব প্রশংসার। নিজের কাজের প্রশংসা এবং তাহার ফলে উন্নতি সকলেরই কাম্য, কিন্তু—

কিন্তু কি?

কিন্তু এইটাই কি জীবনের সব? তুমি কোন সচ্চিন্তা করবার একটু অবসর পাও না, একখানা ভাল বই পড়বার সময় তোমার নেই। আমার কথা আমি ছেড়েই দিলাম। তোমার জীবনে আমার স্থান যে অতি তুচ্ছ—

কি যে বল, তার ঠিক নেই।

আমি ঠিকই বলেছি।

এটা তোমার অন্যায় অভিমান।

অভিমান নয়, যা সত্য তাই বলেছি। এখনও নিজের মনকে প্রতারণা করছ। এর পরে তাও পারবে না।

তুমি বড় কঠোর কথা বলছ। আমার জীবনে তোমার স্থান কখনো ছোট হবে না, হতে পারে না।

এমনি কথা তাঁহাদের মধ্যে মাঝে মাঝে হয়। তাঁহাদের বিলাসব্যসন, তাঁহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, তাঁহাদের অফিসার মহলে সম্মান ও প্রতিপত্তি, তাঁহাদের ক্রমবর্ধমান ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স, তাঁহাদের যৌবনের বিবিধ উচ্ছ্বাস, এ সমস্তই মাঝে মাঝে একটা অনিশ্চয় সংশয়, একটা গভীর অভিমান, একটা নিগূঢ় উদ্বেগের কাল মেঘে যেন আবৃত হইয়া যায়। প্রস্ফুটিত জীবনকুসুমের একটু নীচেই যেন সুতীক্ষ্ণ কণ্টকের আঘাত তাহাদের মনপ্রাণ ব্যাকুল করিয়া তোলে।

দুই

পশ্চিমের একটি বড় সহর। প্রতাপপুর।

সহরের প্রান্তে একটি সুদৃশ্য বাংলো। বাংলোখানির চারিদিকে অনেকখানি করিয়া খোলা জায়গা। গেটের ভিতর ঢুকিলেই চোখে পড়ে দুপাশে নানাপ্রকার ফুলে সাজানো বাগান। মাঝখান দিয়া একটি প্রশস্ত লাল কাঁকর বিছানো মোটর গাড়ীর পথ, বাংলোর সামনে গিয়া গোল হইয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে। মাঝখানে গোল করিয়া সাজানো অনেকগুলি নানাপ্রকার গাছবসান টব। প্রশস্ত সিঁড়ির উপরে প্রশস্ত বারান্দা। এক পাশে কয়েকখানি রংকরা বেতের চেয়ার, মাঝখানে একখানি গোল টেবিল। পাশাপাশি তিনখানি বড় ঘর। মাঝের ঘরখানি বসিবার ঘর। আধুনিক আসবাবপত্রে সাজানো। এক কোণে একটি রেডিও। এ ঘরে বসিলেই দুপাশের দরজার ফাঁক দিয়া দুদিকের সাজানো ঘর দুখানির অনেক আসবাব চোখে পড়ে।

সেদিন রবিবার, সকাল বেলা। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসিয়া মহেশবাবু খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাইতেছেন। কণিকা দেবী চায়ের কেটলি হইতে পেয়ালায় চা ঢালিতেছেন।

চাকর একখানি ট্রের উপরে দুইখানি প্লেটে দুই তিন প্রকার খাবার সাজাইয়া আনিয়া টেবিলের একপাশে রাখিয়া গেল।

কণিকা দেবী বলিলেন, উঃ, এ কয়দিন কি ঘোরাটাই ঘুরলে! গত সাতদিনের মধ্যে একটি পুরো দিনও বাড়ীতে থাক নি।

কি করি বল? আমার কাজই যে এমনি।

এমন করে কতদিন শরীর টিকবে?

তুমি কাছে থাকতে আমার শরীরের জন্য ভাবনা কি?

কেন?

তোমার যত্ন, তোমার আদর, তোমার শুশ্রূষার ফাঁক দিয়ে সাধ্য কি যে কোন অসুখ ঢোকে আমার শরীরে!

হয়েছে। তাই বলে অত অনিয়ম করতে হয়? তাছাড়া, আমার কি ভাল লাগে তোমার এই নিত্য নিত্য ঘুরে বেড়ান?

কণিকা দেবী চায়ের বাটি ও খাবারের প্লেট স্বামীর সম্মুখে সরাইয়া দিয়া নিজেও এক কাপ চা লইয়া চেয়ারে ভাল হইয়া বসিলেন।

মহেশবাবু বলিলেন, সে কি আর আমি বুঝি না। কিন্তু উপায় নেই।

উপায় আছে বই কি। কিন্তু তুমি কাজটাকেই সব চেয়ে বড় মনে কর।

হয়তো করি।

যাক, এ পুরাণো তর্ক আর পুরাণো ঝগড়া বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু আমার সর্বদা ভয় হয়, তুমি কখন কঠিন অসুখে পড়।

শুধু শুধু অমঙ্গল আশঙ্কা করতে নেই।

তুমি যখন তখন যেখানে সেখানে চলে যাচ্ছ, তাঁবুতে, হোটেলে, মোটরে দিন কাটাচ্ছ, সব সময় আমি তোমার কাছেও থাকতে পারিনে, কখন যে কি হয়, ভেবে বাঁচি নে।

অত অস্থির হতে নেই।

কিন্তু তোমারই বা কেন অত মোহ এই কাজের উপর? যথেষ্ট তো হয়েছে। অনেক ছুটি তো পাওনা হয়েছে। আর তো কয় বছর পরেই পেনসনের সময় আসবে, সব পাওনা ছুটিই তো পচে যাবে।

তুমি বোঝ না। শিমলের সেই বড় পদটাব কথা তোমায় বলেছিলাম না সেদিন, সেই পদে যে সাহেব আছেন, তিনি শিগ্‌গিরই বিলেত চলে যাবেন শুনছি। এখন ছুটি টুটি নিতে গেলে হয়তো পদটার জন্য চেষ্টাই করতে পারবো না।

কি হবে আর বড় পদ দিয়ে? যথেষ্ট বড় তো হয়েছ। সেই কাজ, সেই যাতায়াত, সেই ফাইল আর সেই নোট। হ'ল তো। এখন একটু অন্য দিকে মন দিলে হয় না কি? যতই কর, দুদিন পরে তোমার নামও কেউ মনে করবে না। আর কার জন্যই বা এত? ভগবান একটি ছেলে মেয়ে দিলেন না, যে তাই নাড়বো চাড়বো। তুমিও দিন দিন যেন দূরেই সরে যাচ্ছ—

চায়ে একটি চুমুক দিয়া মহেশবাবু বলিলেন, সে কি কথা?

তা তুমি মুখে স্বীকার না করলেও, কাজে তো তাই হচ্ছে।

কখনও না।

যাক গে, আজকের দিনটা আর কোথাও বেরুবে না তো?

না। কেন?

এমনি।

তিন

আজ সমস্ত দিনটাই মহেশবাবু আর কণিকা দেবী খুব আনন্দেই কাটাইতেছেন। গল্প করিয়া, একটু হাসি রসিকতা করিয়া, বহুদিনের ভুলে যাওয়া পুরাণো গান গাহিয়া, রেডিওর চাবি ঘুরাইয়া, আলমারি হইতে নূতন শাড়ী বাহির করিয়া পরিয়া, এঘর ওঘর করিয়া, বাগানে বেড়াইয়া, ফুলের তোড়া বাঁধিয়া, খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া, কণিকা দেবী আজ সত্যই অতিশয় পুলকিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মহেশবাবুও মুগ্ধ হইয়া তাহার সকল আনন্দে অন্তরে বাহিরে যোগ দিতেছেন।

মহেশবাবু একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি বলত?

ব্যাপার আবার কি?

নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে।

কিছুই না! আজকের তারিখটা বলতো? তোমার তো কিছু মনে থাকে না।

ও, তাই তো। একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।

তা তো যাবেই।

না, সত্যি আমার মনে ছিল না।

ছিলই তো না। আমিও তো তাই বলছি। তোমার কাজ ছাড়া তোমার আর কিছুই মনে থাকে না।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। কণিকা দেবী চাকরকে বলিয়াছেন, চায়ের সরঞ্জাম শুদ্ধ বেতের টেবিল এবং চেয়ারগুলি বাগানের মধ্যে সাজাইয়া দিতে। সেখানেই বসিয়া ইঁহারা দুইজন এবং আর একজন অফিসের কর্মচারী একসঙ্গে চা খাইতে বসিয়াছেন।

তিনজনের চা-পান এবং গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে একখানি লাল রংএর সাইকেল চড়িয়া একটি টেলিগ্রাফ পিওন তাঁহাদের টেবিল হইতে একটু দূরে আসিয়া সাইকেল হইতে নামিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিল।

মহেশবাবু তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন।

রসিদ সই করিয়া দিয়া খামখানি হাতে লইয়াই তাহা হইতে টেলিগ্রামটি বাহির কবিয়া এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন, আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।

ভদ্রলোকটি অবস্থা বুঝিয়া, আচ্ছা আজ আসি, মহেশবাবু, বলিয়া বিদায় লইলেন।

কণিকা দেবী বলিলেন, কোথায় যেতে হবে?

এখনি, এরোড্রোমে। লক্ষ্মীটি, আমার কাপচোপড়গুলো চট করে গুছিয়ে দাও।

আজ তোমার যাওয়া হবে না।

আমাকে যেতেই হবে। সময় নষ্ট করো না।

কোথায় যাবে, শুনি?

বিভূতিনগর।

সেখানে তো শুনলুম ভয়ানক অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। কাগজে লিখেছে, সেখানে কলেরার মড়ক আরম্ভ হয়েছে।

আমার কোন ভয় নেই। আমি তো তাঁবুতে থাকবো।

তাঁবুতে থাকলেই কি ভয়ের কারণ চলে গেল?

ভয় করবার সময় নেই আমার। মাত্র এক ঘণ্টা সময় আছে— শিগ্‌গির সুটকেশটা গুছিয়ে ফেল।

আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

কেন ?

অসুখ-বিসুখের মধ্যে তোমাকে একা ছেড়ে দিতে আমার সাহস হয় না।

কিছু ভয় নেই।

না, আমি কোন কথা শুনবো না। আমি যাব তোমাব সঙ্গে, না হয়, তুমি যাওয়া বন্ধ কর।

আমাকে যেতেই হবে।

তাহলে আমাকেও যেতেই হবে।

তর্ক করবার সময় নেই।

আমি এখুনি দুজনের কাপড-জামা গুছিয়ে প্রস্তুত হচ্ছি। তুমি এরোড্রোমে ফোন কর—দুটো সীট চাই।

যাতাযাতের জন্য জিনিষপত্র গুছাইতে কণিকা দেবী সিদ্ধহস্ত। সারাজীবন তো হগাহ করিতে হইযাছে তাঁহাকে। কযেক মিনিটের মধ্যে প্রযোজনীয জামা, কাপড়, জলেব কুজা, ফ্ল্যাস্ক, টিফিনক্যারিয়ার, প্রভৃতি সবহ গুছান হইয়া গেল। চাকরকে দিয়া ট্যাক্সি ডাকিয়া, তাহাকে বাসার তত্ত্বাবধানের কথা ভাল করিয়া বলিয়া কহিয়া, উঁহারা এবোড্রোম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথে ট্যাক্সিতে বসিয়া মহেশবাবু বলিলেন, তুমি না এলেই পারতে।

কেন ?

এই পথের কষ্ট। তার পর বিভূতিনগরের যা ব্যাপার শুনছি, খাওয়া দাওয়া সব বিষয়েই খুবই অসুবিধে হবে।

তা আর কি করা যাবে ?

শুধু শুধু—

হ্যাঁ, শুধু শুধু তুমিই বা যাচ্ছ কেন ? ইচ্ছে করলেই এড়াতে পারতে।

খুব দরকারী কাজ কি না।

আমারও তোমার সঙ্গে যাওয়াটা খুব দরকার।

এরোড্রোমে পৌঁছিয়া তাঁহারা শুনিলেন, সে প্লেনে মাত্র দুইটি সীটই অবশিষ্ট ছিল। মহেশবাবু এবং কণিকা দেবী এরোপ্লেনে গিয়া উঠিলেন।

গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া প্লেন ভূমি ছাড়িয়া আকাশে উঠিল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহারা বিভূতিনগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

চার

বিভূতিনগর। অতি পুরাতন নোংরা সহর। তাহারই এক প্রান্তে প্রকাণ্ড মেলা বসিয়াছে। মেলার আনুষঙ্গিক সকল প্রকার ভাল ও মন্দই প্রচুর পরিমাণে একত্রিত হইয়াছে। জলাভাব এবং জঞ্জালাদি নিষ্কাশনের অব্যবস্থার জন্য রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তবে তাহার প্রাবল্য এখনও এমন আকার ধারণ করে নাই, যাহাতে মেলা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

এই মেলারই অনতিদূরে মহেশ বাবুর তাঁবু। স্থানটি বেশ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। অনেকগুলি লোকজন আছে। মহেশবাবুর মত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর জন্য যতদূর সুব্যবস্থা সম্ভব সবই হইয়াছে।

উঁহাদের জল তুলিবার ভার ছিল যে মালীটির উপর, তাহাকে সর্বপ্রকারে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন কি তাহাকে মেলায় যাইতে বারণ করা হইয়াছিল। অবশ্য সে বারণ কার্যকরী হয় নাই।

একদিন রাত্রে মালীর কুটীরে ভয়ানক কান্নার রোল শুনিয়া তাঁবুর সকলেই ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া শুনিলেন, মালীটির স্ত্রী তখনই কলেরায় মারা গিয়াছে।

ব্যস্ত ও ব্যাকুল মনে সকলের রাত্রি কাটিল।

প্রাতঃকালে মহেশবাবু সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরেই কলেরার সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইল। মালীর স্ত্রীর মৃত্যু এবং মহেশবাবুর পীড়ার সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁবুর সংশ্লিষ্ট লোকগুলি, কেহ বলিয়া এবং কেহ না বলিয়া পলায়ন করিল। রহিল শুধু একটি বৃদ্ধা। সম্ভবত তাহার যাইবার স্থান ছিল না। কিংবা বিধাতার নীরব নির্দেশ পালন করিবার জন্য সে কণিকা দেবীকে অভয় দিল, তোমার কোন ভয় নেই। যা দরকার আমিই করবো।

সহর হইতে ডাক্তার আসিল, যথাসম্ভব চিকিৎসা হইল। মহেশবাবু ক্রমশ আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ক্রমাগত রাত্রিজাগরণ এবং কলেরাক্রান্ত রোগীর শুশ্রূষা করিবার ফলে কণিকা দেবীও ভয়ানক পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারগণের বিশেষ চেষ্টায় এবং উক্ত বৃদ্ধার অক্লান্ত শুশ্রূষার ফলে কণিকা দেবী প্রাণে বাঁচিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য জন্মের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল।

উভয়েই কথঞ্চিৎ সুস্থ হইবার পর এরোপ্লেনেই প্রতাপপুরে ফিরিয়া আসিলেন। বৃদ্ধা অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে তাঁহাদিগকে বিদায় দিল। যাত্রা করিবার সময়ে কণিকা দেবী প্রায় জোর করিয়াই বৃদ্ধার আঁচলে একশত টাকার দুইখানি নোট বাঁধিয়া দিলেন।

কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিয়া মহেশবাবু এক মাসের জন্য ছুটি লইলেন। কণিকা দেবী বলিলেন, এক মাস কেন? এক বৎসরের জন্য ছুটি নাও। কিংবা একেবারে পেনসনের ছুটি নাও।

মহেশবাবু বলিলেন, কি দরকার অত ছুটির? এক মাসেই আমি ভাল হয়ে উঠব। কাজ করতে পারব।

আবার সেই কাজ আর কাজ!

ছুটির এক মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল। মহেশবাবু এবং কণিকা কেহই সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন না।

উভয়েরই শরীরে সাধারণ দুর্বলতা ব্যতীত অন্য নানাপ্রকার উপসর্গ লাগিয়াই রহিল। ওরূপ শরীর লইয়া মহেশবাবুর পক্ষে তাঁহার দায়িত্ব-পূর্ণ কার্যভার বহন প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। শুধু একস্থানে বসিয়া কাজ করিতে হইলে হয়তো পারিতেন, কিন্তু তাহার কাজ তো একস্থানে বসিয়া করা চলে না। অনবরত ঘোরাঘুরি করিতে হয়।

কণিকা দেবীর শরীরও অত্যন্ত দুর্বল। হাঁটিতেই কষ্ট হয়, অন্য কাজ কর্ম তো দূরের কথা? বাসার চাকরগুলি খুব ভাল, তাহাদিগকে বেতনও দিতে হয় খুব ভাল। তাহাদের যত্নে ও চেষ্টায় উহারা ক্রমশ সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কতদিনে যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন, তাহা বুঝা গেল না।

ছুটির মাস শেষ হইতে মহেশবাবু পুনরায় দুই মাসের ছুটি লইলেন।

কণিকা দেবী বলিলেন, আবার দুই মাস! আমি বলছি, তুমি পেনসনের ছুটি নাও।

মহেশবাবু বলিলেন, না, তা হয় না। শিমলের সে সাহেবটি বিলেত গেলে অবস্থাটা কি হয়, তা না দেখে লম্বা ছুটি নেওয়া যায় না।

তোমার শরীরটার অবস্থা কি হয়েছে, দেখেছো? আর কেন? যথেষ্ট কাজ তো করেছ!

আর দুমাসে আমি ঠিক সেরে উঠব। আগের মতই আবার কাজ করতে পারব।

আমাকে আব বেশি দিন পাবে না।

কি যে বল। তুমিও আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠবে।

ছুটিব দুই মাস ক্রমশ শেষ হইল। মহেশবাবু কার্যে যোগদান কবিলেন।

কণিকা দেবীব শবীব কিন্তু আব সাবিল না। ক্রমশই যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতব হইতে লাগিলেন। শবীবেব নানাস্থানে নানাপ্রকাব উপসর্গ আসিযা জুটিতে লাগিল। তাঁহাব পক্ষে বিদেশে আত্মীযস্বজনহীন এই বাংলোয পডিযা থাকা যেন ক্রমশ অসম্ভব হইযা উঠিল। তাছাড়া, হযতো আব কিছুদিন পবেই অন্য কোথাও বদলি হইতে হইবে। এই রুগ্ন শবীবে স্থান পবিবর্তন এবং তজ্জনিত ঝঞ্ঝাট পোহান তাঁহাব পক্ষে এখন অসম্ভব।

অনেক দিন অনেক কথাব পব যখন কণিকা দেবী দেখিলেন, মহেশবাবু কাজ ছাডিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহেন, তখন একদিন তিনি বিষণ্ণ অথচ দৃঢ স্ববে বলিলেন, দেখ, হয কাজ ছাড়, না হয আমাকে ছাড। আমার এখানে বাস কবা আর সম্ভব নয।

মহেশবাবু বলিলেন, সে তো আমিও বুঝতে পাবছি। এই দূরদেশে কোন আত্মীয়স্বজন যে কিছুদিন এসে থাকবে, সে সম্ভাবনাও তো দেখছি নে।

আত্মীয়স্বজন! পঁচিশ বছর পরে হঠাৎ আজ তোমার মুখে আত্মীয়-স্বজনের কথা শুনলাম।

সত্যি, আমি একেবারেই একা।

একেবারে একা এখনও হও নি, এবার হবে।

তাই তো দেখছি। তোমার বোধ হয় কলকাতায় গিয়ে থাকাই উচিত।

উচিত কি অনুচিত, তা বলতে পারি নে। তবে, এ ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

সেই ব্যবস্থাই করা যাক।

কণিকা দেবীর চোখে জল আসিল। বিগত পঁচিশ বৎসরেরও বেশি বাড়ী ছাড়িয়া, দেশ ছাড়িয়া, আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া যে একমাত্র অবলম্বন মনে প্রাণে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, সে বন্ধনটিও আজ শিথিল হইতে চলিল। কি আছে তাঁহার জীবনে? পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজন, যাহা লইয়া মানুষের জীবন, তাহার কিছুই তো তাঁর নাই। বড় অফিসারের স্ত্রী বলিয়া বিভিন্ন স্থানে পার্টিতে যে নিতান্ত মৌখিক, অন্তঃসারশূন্য সম্মান পাইয়াছেন, তাহাই কি তাঁহার সমগ্র নারীজীবনের একমাত্র সার্থকতা? এই জন্যই কি তাঁহার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলে তাঁহাকে পরম ভাগ্যবতী বলিয়া ঈর্ষা করে!

পাঁচ

কলিকাতার একটি ফ্ল্যাটে থাকেন কণিকা দেবী। অসুস্থ শরীর। বাঁধা ডাক্তার ব্যতীত একটি নার্স, দুইটি ঝি ও একটি চাকর সর্বদা তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় নিযুক্ত।

মাঝে মাঝে স্বামীর চিঠি আসে। তিনিও চিঠি লেখেন। কিন্তু তাঁহার রিক্ত মন কিছুতেই ভরে না।

ডাক্তার বলেন, আপনার অসুখ তো প্রায় এক রকমই আছে। বিশেষ বাড়ে নি তো। কিন্তু আপনি সর্বদা এত বিমর্ষ কেন?

কণিকা দেবী বলেন, না, না, বিমর্ষ কেন হ'ব? আপনারা এত

চেষ্টা করছেন, নার্স এত যত্ন করছে। আমি তো ভালই আছি। কিন্তু বুকের সেই ব্যথাটা বেড়েই চলেছে।

ডাক্তার আশ্বাস দেন, আপনি ভয় পাবেন না। শিগ্‌গিরই ভাল হয়ে উঠবেন।

নার্স এসে বলে, আপনি বড্ড ভাবেন। কি খাবেন, বলুন। একটু কমলালেবুর রস এনে দেবো।

না।

একটু বেদানার রস।

না।

ঐ তো আপনার দোষ। কিছু খেতে বললেই, অমনি, না।

আচ্ছা, দাও, একটু পাতলা বালি, লেবুর রস দিয়ে।

ঔষধ চলে, শুশ্রূষা চলে, কিন্তু অসুখ কমে না। কণিকা দেবী স্বামীকে লিখিলেন, আমার অসুখ তো ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কি-দিনের ছুটি নিয়ে একবার এসো।

মহেশবাবু আসিলেন। প্লেন দমদমায় আসিল সকাল নটায়। সেই দিনই রাত্রি আটটায় তাঁহাকে ফিরিতে হইবে।

কণিকা দেবী বলিলেন, আজকের দিনটা থেকে যাও।

মহেশবাবু বলিলেন, অনেক দরকারী কাজ ফেলে এসেছি। থাকবার তো জো নেই। কিছু ভেবো না। আবার সুযোগ পেলেই আসব। ডাক্তারকে নার্সকে ভাল করে বলে গেলাম। নার্সের মাইনেটা এমাস থেকে দশ টাকা বাড়িয়ে দিও।

ঘড়িতে সাতটা বাজিতেই মহেশবাবু ট্যাক্সি ডাকিয়া দমদম এরোড্রোমে যাত্রা করিলেন।

আরো কিছুদিন পরে।

কণিকা দেবীর অসুখ আরো বাড়িয়াছে। ডাক্তার, নার্স এবং দুই একজন আত্মীয়, যাঁহারা মাঝে মাঝে আসেন, সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

একদিন সকালে।

ডাক্তার আসিয়া বুক পরীক্ষা করিতেছেন। নার্স পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। কয়েকজন আত্মীয় এবং বন্ধু অনতিদূরে বিমর্ষ মুখে চাহিয়া আছেন। এমন সময়ে নীচের তলা হইতে চাকর একখানি টেলিগ্রাম লইয়া আসিল।

কণিকা দেবী অতি কষ্টে বলিলেন, দেখি।

টেলিগ্রামখানা তাঁহার হাতে দেওয়া হইল। তিনি চোখের নিকটে ধরিয়া পড়িলেন। পড়িয়া আস্তে টেলিগ্রামখানা বালিশের পাশে রাখিয়া দিলেন।

নার্স কানের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, উনি কি টেলিগ্রাম করেছেন? আসছেন বুঝি?

কণিকা দেবি অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, পড়ে দেখ।

নার্স টেলিগ্রামখানা পড়িয়া দেখিলেন। তাহাতে লেখা, শিমলার সেই সাহেব বিলেত যাওয়াতে তাহার পদ মহেশবাবু পাইয়াছেন।

ইহার পর দিন মহেশবাবু একখানি টেলিগ্রাম পাইলেন, কণিকা দেবীর বাঁচিবার আশা নাই। একবার শেষ দেখা করিবার জন্য অবশ্য আসিবেন। টেলিগ্রামের নীচে নার্সের নাম।

মহেশবাবু দমদমায় প্লেন হইতে নামিয়া কণিকা দেবীর বাসা হইয়া যখন শ্মশানে পৌছিলেন, তখন কণিকা দেবীর দেহ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

মার্চ, ১৯৫২

এন্‌ভেলপ্‌

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ফুটপাথ বাহিয়া চলিয়াছেন মিস অসিতা সেন। গত বৎসর বি. এ পাশ করিয়া বাধ্য হইয়া চাকুরী লইতে হইয়াছে যোগেশ্বরী বিদ্যালয়ে। স্কুলের সময় হইয়াছে। এক বোঝা বই ও খাতা বাম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া, অফিসের ভীড় ঠেলিয়া মিস সেন অগ্রসর হইতেছেন।

বীডন ষ্ট্রীটের মোড় পার হইতেই তাঁহার বাম হাতের নীচ হইতে একখানি এন্‌ভেলপ্‌ টুপ করিয়া পড়িয়া গেল মাটিতে। মিস সেন তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। পথের অন্য লোকেরাও সেটা বিশেষ গ্রাহ্য করিল না। কিন্তু পিছনে আসিতেছিল যোগেশ্বরী স্কুলেরই দশম শ্রেণীর দুটী মেয়ে যমুনা ও অমলা। তাহারা দুই জনেই এন্‌ভেলপ্‌খানি লক্ষ্য করিয়াছে। যমুনা তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া আসিয়া খামখানি তুলিয়া লইল। একখানি বড় সাদা খাম। ভাল করিয়া বন্ধ করা এবং মাঝখানে একটি সীল। খামখানি হাতে পাইতেই উভয়েরই মনে কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। যমুনা বলিল, খামখানা কি করি বল তো? দৌড়ে গিয়ে অসিতাদিকে দিয়ে আসবো?

না ভাই, দেখাই যাক না ভিতরে কি।

সত্যি, অসিতাদিকে এবার জব্দ করা যাবে। খালি আমাদের উপর কড়া শাসন। এইবার দেখাব মজা।

আচ্ছা, খামের উপরে কোন ঠিকানা নেই কেন?

এ আর বুঝলি নে, যদি কেউ দেখে ফেলে। একেবারে পোষ্টাপিসে গিয়ে ফাউণ্টেন পেন বের করে ঠিকানাটা লিখেই অমনি টুপ করে বাক্সের মধ্যে ফেলে দেবেন।

যমুনা বলিল, ঠিক তাই। নইলে সীল করবেন কেন? মানে কেউ যেন খুলে না দেখতে পারে। আত্মীয় স্বজনের কাছে চিঠি লিখতে কেউ সীল করে নাকি?

আচ্ছা, খুলবো খামখানা?

না, না, এখানে নয়। স্কুলের ঘণ্টাও তো প্রায় পড়লো। স্কুলে গিয়ে কিন্তু সাবধান। আর কেউ যেন জানতে না পারে। কেউ যদি গিয়ে লাগায়, তাহলেই বিপদ।

যমুনা খামখানা তাহার বাক্‌খাতার মধ্যে রাখিয়া দিল। অমলা বলিল, তাই বলে আমায় ফাঁকি দিও না কিন্তু।

নিশ্চয়ই না। তোকে ঠিক দেখাবো।

উহারা স্কুলে পৌঁছিতেই ঘণ্টা পড়িয়া যাওয়াতে উহারা সোজা ক্লাশে গিয়া ঢুকিল। অমলা ও যমুনা সাধারণতঃ ভিন্ন জায়গায় বসে। আজ তাহারা একত্র বসিয়াছে।

প্রথম ঘণ্টার শেষে শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া চলিয়া গেলে, আস্তে আস্তে অমলা জিজ্ঞাসা করিল, ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চুপ কর তো। ফড় ফড় করে সব তুই মাটি করে দিবি।

দ্বিতীয় ঘণ্টায় আসিতাদি আসিলেন। অমলা ও যমুনা অতিরিক্ত নিরীহ ও অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া রহিল। এক সুযোগে অমলা বলিল, মুখখানা কেমন শুকিয়ে গেছে দেখেছিস?

শুকোবে না! যখন পোষ্ট অফিসে গিয়ে দেখলেন, খাম নেই,

তখনই হয়তো মূর্চ্ছা যেতেন। তবে হয়তো ভেবেছেন, পথে কোথাও পড়ে গেছে, কে না কে কুড়িয়ে নিয়ে গেছে, কিংবা গরুটরুতে চিবিয়ে খেয়েছে।

দেখছিস নে, পড়াতে পড়াতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন?

হবেন না! অমন চিঠি হারালে সবাই অমন হয়। বেশ হয়েছে। চিঠিখানা একবার পড়ে নি, তারপর দেখাব মজা। আমাদের সবতাতেই দোষ, হাসলে দোষ, খেললে দোষ, বারান্দায় দাঁড়ালে দোষ, গান গাইলে দোষ, কবিতা লিখলে দোষ।

আর ওঁদের কিছুতেই দোষ নেই। দাড়া না, চিঠিখানা একবার পড়ি, তার পর দেখিস কি করি।

স্কুলের সমস্ত সময়টা যমুনা অতি সাবধানে খামখানি আগলাইয়া রহিল, যেন হারাইয়া না যায় বা কেহ দেখিয়া না ফেলে। এই অতি যত্নের ফলে সে দিনের কোন ক্লাশেই কোন পড়াতেই সে মন দিতে পারিল না। অমলারও উদ্বেগ কম নয়, যমুনা কখন যেন তাহাকে না দেখাইয়া খামখানি খুলিয়া পড়িয়া ফেলে।

স্কুলের শেষ ঘণ্টা পড়িল। দলে দলে মেয়েরা স্কুল হইতে বাহির হইয়া এ পথে ও পথে যাত্রা করিল। অমলা ও যমুনা একপাশে একটু নিরিবিলি হইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময়ে আসিতা-দি তাহাদিগকে দেখিয়া ভীষণ ধমক দিয়া বলিলেন, কি হচ্ছে সব এখন। স্কুলের ছুটী হয়ে গেছে। শিগ্গির বাড়ী যাও।

ধমক খাইয়া অমলা ও যমুনা রাস্তায় পা বাড়াইল। যমুনা বলিল, এখনো ধমকানো হচ্ছে। জানেন না তো আমার কাছে কি আছে। কাল থেকে ওসব ধমকান টমকান সব শেষ। যাই একবার বাড়ী।

অমলা বলিল, তা হলে আমি কেমন করে দেখব চিঠিখানা?

তোকে কাল সব বলবো।

না, সে হয় না। তাহলে আজ রাত্রে আমার ঘুমই হবে না।

তাহলে চা-টা খেয়ে একবার আসিস আমাদের বাড়ীতে। আমি খুনিই তোকে নিয়ে যেতুম, কিন্তু বাড়ীতে না বলে এলে তাঁরা ভাববেন চা।

হ্যাঁ ভাই, আমি বাড়ী গিয়েই চলে আসব তোর বাড়ী। এর মধ্যে মখানা খুলবে না কিন্তু। তোমার ম্যাট্রিকের দিব্বি রইল।

আচ্ছা, ভাই আচ্ছা।

যমুনা ও অমলা নিজ নিজ বাড়ী ফিরিল। তাহাদের বাড়ী বেশী দূরে । প্রায়ই এক সঙ্গে যাতায়াত করিয়া থাকে। অমলা একটু পরেই নাদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। গিযাই জিজ্ঞাসা করিল, লে" নি তো ?

না, না। চুপ কর। ও ঘরে সবাই রয়েছেন! চল আমরা দিকে আমার পড়ার ঘরে যাই। সেখানে এখন কেউ ই।

যমুনার পড়ার ঘরে গিয়া একখানি ছোট টেবিলের পাশে দুইজনে খানি চেয়ার পাতিয়া বসিল। যমুনা খামখানি আনিয়া টেবিলের ার রাখিতেই বাহিরে জুতার শব্দ হইল। যমুনা তাড়াতাড়ি বলিয়া ঠিল, ওই ছোট-কা আসছেন।

তাড়াতাড়ি খামখানা বুকের মধ্যে লুকাইয়া বলিল, তা তোর ায়োগ্রাফী পড়া কেমন হচ্ছে ?

পায়ের শব্দ সরিয়া যাইতেই যমুনা চিঠিখানি আবার বাহির করিল। হনে মাথা নীচু করিয়া আস্তে আস্তে খামখানির এক পাশ ছিঁড়িয়া িলল। উহাদের বুকের মধ্যে তখন দুরু দুরু করিতেছে। কেবলই

ডানদিকে ও বামদিকে চাহিতেছে, কেহ আবার আসিয়া পে কি না।

খামের একপাশ ছেঁড়া হইল। তারপর আস্তে আস্তে তাহার ভিত হইতে একখানি ভাঁজ করা কাগজ বাহির হইল। অমলা বলিল, আমি খুলি।

আঃ অত ব্যস্ত কেন? আমিই তো খুলছি। এই ত্যাখ্।

অমলা দেখিল, যমুনাও দেখিল। একখানি সাদা লম্বা কাগজ তাহাতে লম্বা ভাবে দুই সারি সংখ্যা। এক সারিতে লেখা, এক, দু তিন, চার, পাঁচ, ইত্যাদি। তাহার পাশে আর এক সারিতে লে চুয়ান্ন, পঁয়ত্রিশ, পঁচাত্তর, বাইশ, তেতাল্লিশ, ইত্যাদি। কাগজের উপ ভাগে লেখা, বার্ষিক পরীক্ষা, নবম শ্রেণী, ইতিহাস।

জুলাই, ১৯৪৬

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ও ভারতবর্ষ প্রেস, ৩, ... ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত।